সূচীপত্র

জগৎ জোড়া জাল ২

মাতালের অজুহাত ৩

পিন্টুর প্রেম ৫

ততটা রোম্যান্টিক নয় ৮

গণিতাঙ্গুলি ১৩

ন্যাশনাল হাইওয়ে ৪ .... ১৭

সমীকরণ-অসমীকরণ ২১

খিচুড়ি ২৬

জীবাণু ৩২

জগৎ জোড়া জাল

জগৎ জোড়া জাল,   আজব সে এক কল।
জানলা খুলে মুখটি বাড়াও   দেখবে তাহার চাল।
আকাশব্যাপী বাতাসব্যাপী   জগৎ জোড়া জাল।

পাড়ার খবর, দেশের খবর,   সাগরপারের লোকের খবর,
তোমার খবর – তাও রয়েছে   নেই তো কিছুই আড়াল।
বেতার সুতোয় সবাই বাঁধা   জগৎ জোড়া জাল।

দুষ্টু মেয়ে বায়না ধরে   নতুন পুতুল খেলার তরে।
ডেপো ছেলে চাইছে খেতে   জ্ঞানবৃক্ষের ফল।
ভাবছ কেন আছে যখন   জগৎ জোড়া জাল।

চিন্তামণির ভাবনা ভীষণ,   করছিল সে গো অন্বেষণ।
বণিকমশাই ব্যস্ত, কারণ   বেচবে সে তার মাল।
সবার তরেই দোর খোলা তার   জগৎ জোড়া জাল।

সঙ্গীহারা বন্ধু খোঁজে,   বোদ্ধা রসিক শিল্প বোঝে।
বাচাল শুধুই তর্ক করে   বাড়ায় কোলাহল।
ঊর্ণনাভ তাঁত বুনে যায়   জগৎ জোড়া জাল।

নাবিক এ কী মৌন যেন!   নৌকা তোমার শান্ত কেন?
বাতাস আসে, নোঙর তোল,   জোরসে বাঁধ পাল।
ডাক দিয়েছে সবার প্রিয়   জগৎ জোড়া জাল।

[জুলাই ২, ১৯৯৭]

মাতালের অজুহাত

আজ রাতে মাত্র দু পেগ হুইস্কি গলায় পড়তেই অনেক ঘটনা মনে পড়ে গেল।

কয়েকমাস আগে রেললাইনের ধারে অন্তঃসত্ত্বা যুবতীর লাশ দেখেছিলাম। পুরোটা না। ওর একটা পায়ের বেশীর ভাগটাই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তারপর সেদিন বড় রাস্তার মোড়ে শীর্ণ পকেটমারটা বেদম মার খাওয়ার পর একটু জল খেতে চেয়েছিল বলে তার মুখে পেচ্ছাপ করে দেওয়া হল। আমি তখন কাছেই ছিলাম।

আর একদিন কাগজে পড়লাম কোনো এক যুদ্ধবন্দীর দুহাতের আঙুলের অস্থিসন্ধিগুলো উল্টোদিকে মুড়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ওর আর্তনাদও যেন আমি শুনতে পেলাম।

মুখটা বড় তেঁতো লাগে।
আর এক পেগ হুইস্কি এক চুমুকে শেষ করি।
কতদিন আগে সেই মিষ্টি জলের ঝর্ণাটা দেখেছিলাম।
তার সাবলীল ছন্দের সুরেলা আওয়াজ কানে বাজে না আর।
ভোরের আবছায়ায় কোকিলের ডাক কিংবা দ্বাদশীর রাতে গাছের পাতার মর্মর –
সবই কেমন বিস্বাদ মনে হয়।

দেখতে দেখতে চতুর্থ পেগটা আত্মসাৎ করি।
লোকে বলে মদ খেলে নাকি সব কিছু রঙীন লাগে।
আমার কিন্তু তা হয় না। আমি বরং একটু অন্ধকার দেখি।
দুচোখের লেন্সদুটো ঠিকমত ফোকাস করতে পারি না।
চারপাশের চিৎকারগুলোও অনেক দূর থেকে আসছে মনে হয়।

আরো একটা পেগ শুরু করি।
নিজেকে এবার অনেক হাল্কা লাগে।
বেঁচে থাকার কারণগুলো ধীরে ধীরে ফিরে পাই।
ছোটবড় দুঃখগুলো আছে, থাক।
মদ সেগুলোকে অনেক সহনীয় করে তোলে।
জীবনের উন্নততর বিকল্প খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করি না আর।

বোতল উজাড় করে তলানিটুকু গেলাসে ঢালি।
এলোমেলো হাতে গেলাসটা আঁকড়ে ধরি।
আমি বাঁচতে বড় ভালোবাসি।
মরণের পরে কিছুই থাকে না – দুঃখগুলোও না।
তাই প্রতি রাতের শেষে পুরোনো সূর্যকে একইভাবে ফিরে পেতে ভালো লাগে।
তাছাড়া এমনটাও তো হতে পারে –
কালকের দিনটা আজকের থেকে অনেক বেশী সুন্দর হবে।

[জুলাই ৭, ১৯৯৭]

পিন্টুর প্রেম

শাশ্বতীর সঙ্গে পিন্টুর বিয়ের প্রায় সবই ঠিকঠাক। শুধু একটা কারণে সেটা আর কিছুতেই হয়ে উঠছে না। শাশ্বতীর তো পিন্টুকে বর হিসেবে খুবই পছন্দ। আর পিন্টুও শাশ্বতীর মতো এমন মিষ্টিস্বভাব, সুরসিকা মেয়ে দুটি দেখে নি। তবু পিন্টু ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত।

ওদের পরিচয়ের সূত্রটা অবশ্য ততটা রোম্যান্টিক নয়। বছর দেড়েক আগে পিন্টুর বাবা শশধর চন্দ্র সোম বইমেলায় ঘুরছিলেন একা একা। কাঁধে এক ব্যাগ বই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল তার অফিসের সহকর্মী তপনকে। তপনের মেয়ে শাশ্বতী বাবার সঙ্গে বইমেলায় এসেছিল সেদিন। সেই এক দেখাতেই শশধরবাবু মনে মনে শাশ্বতীকে পুত্রবধূর আসনে বসিয়ে ফেললেন। তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। শশধরবাবুই প্রথম প্রস্তাব তুললেন। তপনবাবু কোনো আপত্তি করলেন না। ফলে পিন্টু আর শাশ্বতীর পরিচয় হল। গত একবছর ওরা একসঙ্গে গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইত্যাদি যে যে জায়গায় ঘোরার কথা সে সব জায়গাতেই ঘুরেছে, সিনেমা দেখেছে, আলুকাবলি খেয়েছে এবং সর্বোপরি নিজেদের অনেকটা চিনেছে।

এমতাবস্থায় আমাদের গল্পের নায়ক নায়িকা তাদের সম্পর্কটাকে একটা জীবনব্যাপী স্থায়িত্ব দিতে চাইবে সেরকমই আশা করা যায়। কিন্তু পিন্টুর একটা অদ্ভুত সমস্যা আছে। সেই কথাই এবারে বলা যাক।

কয়েক বছর আগেকার কথা। সেই সময় পিন্টু কলেজে পড়ে। তার বয়স তখন উনিশ কুড়ি হবে। সেবারের দুর্গাপুজোর সময় সপ্তমীর দিন সকালবেলায় ঘটনার সূত্রপাত। পিন্টু ওদের পাড়ার পূজামণ্ডপের পাশে একটা ঘেরা জায়গায় বসে তার কয়েক বন্ধুর সঙ্গে ফল কাটছিল প্রসাদ বানানোর জন্য। সেখান থেকে প্যান্ডেলের সামনের খানিকটা অংশ দেখা যায়। সকালবেলায় কম হলেও অনেক লোকজন প্রতিমাদর্শন করতে আসছিল। সেই ভীড়েই পিন্টু প্রথম মেয়েটাকে দেখে। পরনে আঁটো নীল জিন্স্ আর ঢলঢলে টি-শার্ট।

আহা, কী তার রূপ! একমাথা কালো ঢেউ খেলানো চুল কাঁধ থেকে পরিপাটী করে কাটা। টলটলে টানা টানা দুটো চোখ। সরু ঠোঁট। বিধাতা যেন তার সমস্ত মাধুরী ঢেলে এমন সৌন্দর্য বানিয়েছে।

আধকাটা একটা বাতাবী লেবু হাতে ধরে পিন্টু গোগ্রাসে সেই সৌন্দর্যসুরা পান করে চলল। মিনিট খানেক কি দুয়েক বাদে মেয়েটা চলে গেল প্যান্ডেল ছেড়ে। তার কিছুক্ষণ বাদে পিন্টু সম্বিৎ ফিরে পেল। বাইরে বেরিয়ে অনেকক্ষণ সে এদিক ওদিক দেখল। কিন্তু মেয়েটাকে আর কোথাও খুঁজে পেল না।

সেই দিন থেকে পিন্টুর চিত্তবৈকল্য শুরু হল। সে দেখতে দেখতে হু হু করে সেই নাম-না-জানা ধাম-না-জানা মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেল। যৌবনের প্রথম প্রেম – একে ঠেকিয়ে রাখা যে শিবেরও অসাধ্যি। পিন্টুর ঘুম চলে গেল, ক্ষিধে কমে গেল, পড়াশুনো শিকেয় উঠল। তার সারা জগৎ ভরে উঠল সেই অনামিকা মানসীর অমূর্ত উপস্থিতিতে। এ এক অদ্ভুত প্রেম যাতে শুরু নেই, শেষ নেই, হাসি নেই, কান্না নেই, মিলন নেই, বিরহ নেই। এরকম অবস্থা চলল অনেকদিন। তারপর পিন্টু কবি হল। তার হৃদয়ের আকুতি কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। দু একটা কবিতা কলেজের ম্যাগাজিনে ছাপাও হল। তা পড়ে পিন্টুর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যারা তার এই বৈকল্যের ঘটনা জানত, তারা কেউ 'বা বা' করল, কেউ কেউ বলল

'এভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না'। আর অন্যরা সবাই কবিতাগুলোকে 'ট্যানকাব্য' বলে উড়িয়ে দিল। পিন্টু কিন্তু দমল না। সে তার অদৃশ্য প্রিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেম আর কবিতা দুইই চালিয়ে যেতে থাকল।

সময় বয়ে চলল। কোনোক্রমে পরীক্ষায় পাশ করে পিন্টু একটা ছোট চাকরিতে ঢুকল। সে আজ থেকে বছর চার পাঁচ আগের ঘটনা। এখন অবশ্য পিন্টু আর কবিতা লেখে না। তার প্রথম প্রেমের সেই ধাক্কাটাও অনেক সামলে উঠেছে। কিন্তু সেই মেয়েটিকে সে আজও ভুলতে পারে নি। তার সেই অসামান্য সৌন্দর্য, সেই অতুলনীয় দেহসৌষ্ঠব সবই পিন্টুর হৃদয়ে গেঁথে বসে আছে। তাই তো সে বুঝতে পারছে না শাশ্বতীকে তার হৃদয়ের কোথায় স্থান দেবে।

এ ব্যাপারে একটা শেষ মীমাংসা করার জন্য পিন্টু কদিন হল পুরী এসেছে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে। তার পরিচিত গণ্ডীর বাইরে সম্পূর্ণ একাকীত্বে সে ঠিক করতে চায় কে তার কাছে বড় – শাশ্বতী না সেই কল্পমানবী। তাই এই পুরী আসা।

তিন দিন তিন রাত্রি ধরে পিন্টুর মনাঙ্গনে তার আপাত অলীক প্রণয়িণী আর শাশ্বতীর তুমুল যুদ্ধ হল। যুদ্ধ যখন মিটল তখন দেখা গেল শাশ্বতী হেরে গেছে। পিন্টু যুক্তি খাড়া করল এই যে তার হৃদয়ের বেশীর ভাগটা জুড়েই যখন একজন বিরাজ করছে তখন শাশ্বতীর সেখানে আসাটা ঠিক নয়। পিন্টুর অবয়বহীন প্রেম একদিন মূর্ত হয়ে উঠতেই পারে। আর তা যদি নাও হয়, তাহলেও তো সে শাশ্বতীকে তার সম্পূর্ণ ভালবাসা দিতে পারবে না। তাদের বিয়ে হলে যখন অন্তরঙ্গ মুহূর্ত আসবে, তখন সে শাশ্বতীর শরীরে অন্য এক মানবীর দেহ খুঁজে পেতে চেষ্টা করবে। সেটা শুধু নিজেকেই নয়, শাশ্বতীর প্রতিও বিশাল একটা বঞ্চনা হবে। শাশ্বতী বড় ভাল মেয়ে। তাকে সে ঠকাতে চায় না। অতএব এই বিয়েটা না হওয়াই ভাল। প্রয়োজনে পিন্টু আজীবন অকৃতদার থাকতে আগ্রহী।

কিন্তু এসব কথা শাশ্বতীকে সে জানাবে কি করে ? পিন্টু ভেবে দেখল মুখোমুখী কথা বলার মনোবল সে পাচ্ছে না। তাই সে সারাদিন ধরে বসে কুড়ি পাতা লম্বা একটা চিঠি লিখে ফেলল। তারপর সেটাকে একটা সুদৃশ্য খামে মুড়ে একটা কুরিয়ার কোম্পানীতে পোস্টও করে দিল।

এইবার পিন্টুর বেশ হাল্কা লাগছে। সে একটা দুর্বিষহ মায়াজাল কেটে বেরোতে পেরেছে। হয়তো সে আরো বড় একটা কুহকজালে আবদ্ধ। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। সে তার প্রথম রোম্যান্সের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পেরেছে। এটা তার কাছে এক বিশাল জয়। শাশ্বতীর কথা ভেবে তার দুঃখ হচ্ছিল অবশ্য। তাদের এই এক বছরের মেলামেশা, সুখদুঃখ আদানপ্রদান এ তো মিথ্যে হয়ে গেল। শাশ্বতীকে কি সে আর মুখ দেখাতে পারবে ? নিদেনপক্ষে একজন বন্ধু বা পরিচিত হিসেবেও ? শাশ্বতীর সঙ্গে পরিচয় না হলেই যেন ভাল হত।

হঠাৎ পিন্টুর হোটেলের ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। অবসন্ন পায়ে দরজাটা খুলে পিন্টু একটা আচমকা ধাক্কা খেল। দরজায় দাঁড়িয়ে তারই মতন বয়সের একটা লোক। চেহারাটা ভীষণ মেয়েলি। লোকটা একটু ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলল, 'আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম পরম নমনীয় ধর। আমি আপনার পাশের ঘরেই উঠেছি। আমার স্ত্রী-এর হাতটা একটু পুড়ে গেল কিনা। তাই ভাবলাম বারনল জাতীয় কিছু একটা যদি পাওয়া যায়। কিছু মনে করলেন না তো ভাই ?' পিন্টুর কাছে বারনল ছিল না। সে দুঃখ প্রকাশ করে লোকটাকে বিদায় দিল।

পিন্টু হাত দিয়ে মাথা চেপে বিছানায় বসে পড়ল। এত বড় ভুল মানুষের হয় ! এই মুখ সে আজও ভোলে নি। সেই ঢেউ খেলানো চুল। টানাটানা চোখ। সরু ঠোঁট। হ্যাঁ, তার সেই মানসীই বটে। সে আজ এতো বছর বাদে এতো ঘটনার পরে শেষটায় পুরুষের বেশে ধরা দিল ! কি ভুল ! কি ভুল !

পিন্টু অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল কিভাবে আত্মহত্যা করলে কষ্ট কম হয়। তারপর হঠাৎ তার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এল। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একটা এস.টি.ডি. বুথ খুঁজতে বেরোলো। শাশ্বতীর সঙ্গে এখনই কথা বলা দরকার।

[আগস্ট ২১, ১৯৯৮]

ততটা রোম্যান্টিক নয়

চলন্ত বাস থেকে তড়াক করে লাফ মেরেই শঙ্খশুভ্র বুঝতে পারল ভুল করেছে সে। কলকাতার বাসে যেমন ভীড় হয় বাসটা সেই তুলনায় অনেক ফাঁকাই ছিল। তা সত্ত্বেও কে যেন কার পা মাড়িয়ে দেওয়ায় তুমুল ঝগড়া হচ্ছিল। শঙ্খশুভ্র এরকম ঝগড়া দেখতে অভ্যস্ত। কলকাতার ভীড় বাসে তা বাসস্টপ আসার মতই অবধারিত। শঙ্খশুভ্রর মনে হয় এই প্যাচপ্যাচে গরমে আপামর যাত্রীসাধারণের চিত্তবিনোদনের সামগ্রী এই ছোট ছোট ঝগড়াগুলোই। আরো মজার ব্যাপার দর্শকাসনে দণ্ডায়মান তৃতীয় ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ এবং ঠাণ্ডা মাথার তীর্যক ও উত্তেজক মন্তব্য। শঙ্খশুভ্রর এসব ভালই লাগে। সে এও জানে যে পা মাড়ানোর ঝগড়া বিতর্করত ব্যক্তিযুগল পরস্পরকে ট্যাক্সি চড়ে যাবার উপদেশ দিয়েই শেষ করে থাকে। তাও শঙ্খশুভ্র মন দিয়ে সব কথা শোনে, এই এখন যেমন শুনছিল। ভুলটা সেখানেই হল।

হঠাৎই শঙ্খশুভ্র আবিষ্কার করল তার কলেজের গেট এসে গেছে। কয়েক মিটার দূরেই বাসস্টপ। সেখানে থামার জন্য ড্রাইভার বাসের গতি কমিয়েছে। শঙ্খশুভ্রর তর সইল না। সে ওখানেই লাফ দিল।

দিয়েই দেখল এক হাতের মধ্যেই একটা গরু। শিং বাগিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবার জন্যেই যেন দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্খশুভ্র জানে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী তাকে সাম্যাবস্থায় পৌঁছোতে গেলে কয়েক পা দৌড়োতে হবে, না হলে আছাড় খেতে হবে। গরুটা এমনই বেখাপ্পা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যে দৌড়োনো বা আছাড় খাওয়া কোনটাই শঙ্খশুভ্রর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব প্রবল শারীরিক ও মানসিক ক্ষিপ্রতায় সে সমকোণে নিজের গতিপথটাকে ঘুরিয়ে দু ফুট মতন দূরে গিয়ে থামল।

বিপদ কিন্তু এখানেই শেষ হল না। ঠিক ঐ জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অণুচক্রিকা ঘোষ দস্তিদার ফুচকা খাচ্ছিল। সে যখন দ্বিতীয় দফার তৃতীয় ফুচকাটিকে গলাধঃকরণ করার জন্য মুখের কাছে বাড়িয়েছে ঠিক তখনই তার কনুইয়ে ছোট্ট একটা খোঁচা মেরে শঙ্খশুভ্রর শরীর শান্ত হল। আর ফুচকা বাবাজীবন শঙ্খশুভ্রর অবশিষ্ট ভরবেগটুকু নিজদেহে অবলম্বন করে অণুচক্রিকার হস্তচ্যুত হয়ে নিখুঁত প্যারাবোলিক পথে ল্যান্ড করল শঙ্খশুভ্রর অংকের মাস্টারমশাই ভবতোষ প্রামাণিকের 'অবাক পৃথিবী' শিরোদেশের ঠিক ভরকেন্দ্রে।

প্রবল গাণিতিক দক্ষতায় ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে রুমাল দিয়ে টাক মুছতে মুছতে কলেজের দিকে ঢুকে গেলেন ভবতোষবাবু। তার আগে অণুচক্রিকা আর শঙ্খশুভ্র দুজনের দিকেই ক্ষণিকের জন্য তীব্র কটাক্ষ হেনে গেলেন। শঙ্খশুভ্র প্রমাদ গণল, এবার অংক পরীক্ষায় তার আর নিস্তার নেই। ফেল অবধারিত।

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস করে সমস্ত জাগতিক ঘটনার পিছনেই কারোর না কারোর অবদান থাকে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই সে তার বিশ্লেষণশক্তি প্রয়োগ করে অবদানকারীদের খুঁজে বার করতে চায়। অনুসন্ধানশেষে দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট সবাই দোষী, নির্দোষ একমাত্র সে নিজে। এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। সে ভাবল এই এত কম ভীড় বাসে কি করে একে অন্যের পা মাড়াতে পারে। এত বড় শহরের একটা বাসস্টপে একটা গরু কেনই বা দাঁড়িয়ে থাকবে। অণুচক্রিকা সাত সকালে কলেজে এসেই কেন ফুচকা খেতে চাইবে। আর ভবতোষবাবুই বা কেন উড়ন্ত ফুচকার দিকে টাক পেতে না দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করবেন না। এছাড়াও বাসের ড্রাইভার, বাসস্টপের ডিজাইনার, ফুচকাঅলা, কলকাতার মেয়র এদের

সবাইকে সে দোষারোপ করতে ভুলল না। এমনকী সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে নুড়ি কুড়োনোয় ব্যাপৃত জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীটিকেও সে রেহাই দিল না। তিনি বলবিদ্যার অন্যরকম সূত্র দিয়ে গেলেই আজ এমনটি হত না।

অণুচক্রিকাকে শঙ্খশুভ্র চিনত। ওদের পাশের ডিপার্টমেন্টের মেয়ে। শঙ্খশুভ্রর এক বছরের জুনিয়র। কলেজের কোনো এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ওদের পরিচয় হয়েছিল। তারপর রাস্তাঘাটে মাঝেমধ্যে দেখা হলে পরিচয়সূচক হাসি, হয়তো বা দু একটা কুশল বার্তা বিনিময় – ব্যাস, ঐটুকুই।

শঙ্খশুভ্র জানে দোষটা তার নয়। তবু সে অণুচক্রিকার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বিদায় নিল। ভবতোষবাবুকে এড়ানোর জন্যই কি না কে জানে সে পরের গেট দিয়ে ঢুকে অনেক ঘুরপথে নিজের ক্লাসে হাজির হল।

* *

পরীক্ষার ফল বেরোলে শঙ্খশুভ্র দেখল তার অনুমান অভ্রান্ত। সে সত্যিই ভবতোষবাবুর পেপারে ফেল করেছে। তার প্রচণ্ড রাগ হল। দুঃখও হল। ভবতোষবাবুকে গিয়ে কিছু বলে এমন সাহস তার নেই। আর সেই ফুচকা কেলেংকারির অন্যান্য খলনায়কদের সে হাতের কাছে পাচ্ছেই বা কই ? একমাত্র অণুচক্রিকা ছাড়া।

জীবনটা এমনই যে ঠিক সেদিনই রাস্তায় অণুচক্রিকার সঙ্গে শঙ্খশুভ্রর দেখা হয়ে গেল। দেখামাত্রই সে অণুচক্রিকার ওপর ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং গণিত পরীক্ষায় তার অকৃতকার্যতার সমস্ত দায় অণুচক্রিকার ওপর চাপিয়ে দিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে অণুচক্রিকা তো এর কোনো প্রতিবাদ করল নাই, উল্টে সেই দায় নির্দ্বিধায় নিজস্কন্ধে টেনে নিল — ওরা প্রেমে পড়ল।

* *

এর তিন বছর পরে ওরা হাত ধরাধরি করে বিয়ের কার্ড বিলি করতে বেরোল। প্রথম এবং সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি ভবতোষবাবু। তাঁকে তাঁর ঘরেই পাওয়া গেল। তিনি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছিলেন। আর বোধহয় গণিতের কোনো দুরূহ তত্ত্বের সত্য মিথ্যা যাচাই করছিলেন। ওদের দেখে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন চিনতে। তারপরেই আচমকা বলে বসলেন, 'বিয়ের নেমন্তন্ন ? তা বেশ। আমি জানতাম, তোমরা আসবে।'

শঙ্খশুভ্র আর অণুচক্রিকা দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক। শেষটায় জড়তা কাটিয়ে শঙ্খশুভ্র বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আপনি না থাকলে, মানে আপনার পরীক্ষায় আমি ফেল না করলে আজ বোধহয় –'

শঙ্খশুভ্রর কথা শেষ হবার আগেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ভবতোষবাবু হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ভুল, ভুল, এটা তুমি ভুল বললে। আমার পরীক্ষায় ফেল না করলেও তোমরা বিয়ে করতে।'

– 'মানে ?'

– 'তুমি কি মনে করো তোমাকে আমি ইচ্ছে করে ফেল করিয়েছিলাম ? তবে শোনো, তা একেবারেই নয়। সেবার আমি দশটা অংক দিয়েছিলাম। যেকোনো পাঁচটার উত্তর দিতে হবে। তুমি দশটাই শুরু করেছিলে। একটাও শেষ করো

নি। এরপর তুমিই বল আমি কি করে তোমাকে পাশ করাই। গণিতের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আমার আছে তো, না কি ?'

শঙ্খশুভ্র আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ, মানে –'

ভবতোষবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, 'কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কেন তুমি একটাও অংক পারলে না জানো ? এর উত্তর পাওয়া গিয়েছিল খাতার শেষ পাতায়। সেখানে তুমি লাল কালি দিয়ে একটা অদ্ভুত ছবি এঁকেছিলে। আপাতদৃষ্টিতে হিজিবিজি। কোনো মাথামুণ্ডু নেই। একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে একটা অস্পষ্ট নারীমূর্তির ছবি সেটা। অজস্র ছোট ছোট রেখা ছিল তাতে। যদি ধরে নিই এক একটি রেখা আঁকতে তোমার এক সেকেন্ড করে সময় লেগেছে, তাহলে আমি হিসেব করে দেখেছি গোটা ছবিটা আঁকতে তোমার সময় লাগা উচিত পাঁচ ঘণ্টা সাড়ে সাঁইত্রিশ মিনিটের কিছু বেশী। কিন্তু তিন ঘণ্টার মধ্যে সেটা এঁকেছিলে। তার পরে অংক করার সময় থাকে কোথায় ?'

শঙ্খশুভ্র লজ্জায় লাল হতে শুরু করেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ভবতোষবাবু বলে চললেন, 'সেই ছবিটার তলায় অস্পষ্ট হরফে কি লিখেছিলে মনে আছে ? লিখেছিলে – "অণু তোমাকে"। আমার কলিগ পঞ্চব্যাঞ্জন দে অণুচক্রিকাদের ক্লাশ নিত। ওর কাছে খোঁজ নিয়ে অণুচক্রিকার নাম জেনেছিলাম। তখনই আমি বুঝেছি তোমার পরিণতি – মানে আজকে যা বলতে এসেছ তার কথা। আমি এখানে নিমিত্তমাত্র।'

শঙ্খশুভ্রর আঁকা সেই ছবিটা ভবতোষবাবু ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। বিয়ের দিন একটা সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে ওদের উপহার দিয়েছিলেন ছবিটা।

* *

এর পর দীর্ঘ তিরিশ বছর কেটে গেছে। শঙ্খশুভ্রর ঘরে আজও ছবিটা টাঙানো আছে। সেটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে যৌবনের সেই অবুঝ, রঙীন দিনগুলোর কথা ভাবছিল শঙ্খশুভ্র। একটা হারানোর অনুভূতি, তার সঙ্গে একটা তীব্র ভালো লাগা, একটা অপরিসীম পরিতৃপ্তি মিলেমিশে শঙ্খশুভ্রকে বিহ্বল করে দিল। কাঠের ফ্রেমটাতে আলতো করে স্পর্শ করে সে কি খুঁজতে চাইল তা সেই জানে। তার ভালো লাগল, না খারাপ লাগল, তা বুঝতে পারল না। অনেকক্ষণ ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর তার দৃষ্টি গেল অণুর বাঁধানো ফটোগ্রাফটার দিকে। 'কেন, কেন, এত তাড়াতাড়ি আমায় একা ফেলে চলে গেলে অণু', ভাবতে লাগল সে। আর নিজের অজান্তেই ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল।

কলিং বেলের শব্দে তার সম্বিৎ ফিরে এল। সুতনু এসেছে নিশ্চয়ই। তাদের একমাত্র সন্তান। এখন ক্যালিফোর্নিয়ার একটা বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারস পড়ে। সুতনু শঙ্খশুভ্রর বিশাল গর্ব। এই তো কিছুদিন আগেই একটা চিঠিতে জানিয়েছে সে নাকি ওখানকার পরীক্ষায় গ্রেড পেয়েছে চার-এ চার। তাছাড়া ওর একটা পেপার নাকি কোনো এক বিখ্যাত কনফারেন্সে 'বেস্ট স্টুডেন্টস পেপার' মনোনীত হয়েছে।

সুতনু, সুতনু – শঙ্খশুভ্রর গর্ব। তার মধ্যে সে তার পরলোকগত স্ত্রীকে এখনও খুঁজে পায়। সেই একই রকম মুখের গড়ন, গায়ের রঙ, কথা বলার ভঙ্গী।

আজই সুতনুর আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার কথা। শঙ্খশুভ্র বাতের ব্যাথার জন্য এয়ার পোর্ট যেতে পারে নি। সুতনু অবশ্য ফোনে জানিয়েছে তাতে কোনো সমস্যা নেই, সে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা বাড়ী পৌঁছে যাবে।

চোখের জল মুছে শঙ্খশুভ্র দরজা খুলল। সুতনু ওর সেই ঝলমলে হাসিটা সারা শরীরে মেখে দাঁড়িয়ে আছে।

* *

রাত্রে খাবার পরে সুতনু কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'বাবা একটা কথা বলব। রাগ করবে না বলো।'

শঙ্খশুভ্র আশ্বাস দিল, 'তোর ওপর কি আমি রাগ করতে পারি ? বল, কি বলবি।'

সুতনু আমতা আমতা করে বলল, 'বাবা, আমি, মানে জানো, আমি প্রেমে পড়েছি। মেয়েটার নাম বারবারা। ইটালির মেয়ে। আমার ক্লাসমেট। বাবা, বারবারা বড়ো ভালো মেয়ে। আমার জীবনটা ওর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমি ওকে বিয়ে করব। তুমি রাগ করবে ?'

শঙ্খশুভ্র ছেলের পিঠে আলতো থাপ্পড় মেরে বলল, 'রাগ ? রাগ করব কেন ? ভালোবাসার কি স্থান-কাল-পাত্র থাকে ?' আর মনে মনে যোগ করল, 'বাপ কা বেটা !' একটু থেমে আবার বলল, 'বারবারার গল্প বল।'

সুতনু প্রবল উৎসাহে বলতে শুরু করল, 'বাবা, জানো তো, ব্যাপারটা ভীষণ রোম্যান্টিক –'

এইবার শঙ্খশুভ্র একটু হোঁচট খেলো। তার অনবধানেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'অ্যাঁ ! তা কি করে হয় ? এই যে তুই লিখেছিস পরীক্ষায় ফুল মার্কস পেয়েছিস। তাছাড়া কিসব প্রাইজ ট্রাইজ –'

সুতনু যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে বলল, 'বাবা, ওটা নম্বর নয়, গ্রেড পয়েন্ট। আর প্রাইজ নয়, অ্যাওয়ার্ড। কিন্তু তার সঙ্গে বারবারার কি সম্পর্ক ?'

শঙ্খশুভ্র বলতে যাচ্ছিল, 'বাঃ, সম্পর্ক নেই ? আমি তো তোর মায়ের প্রেমে পড়ে —'। শেষ পর্যন্ত কথাটা গিলে ফেলে বলল, 'সম্পর্ক নেই বলছিস ? বেশ তাহলে বল তোর রোম্যান্টিক কাহিনী।' বলল বটে, কিন্তু তার কেমন সন্দেহ থেকেই গেল যে ব্যাপারটা যেন ততোটা রোম্যান্টিক নয়। সে ভাবল, 'ঠিক আছে, শুনেই দেখা যাক না ছেলে কি বলে !'

সুতনু খানিক থেমে বলতে শুরু করল, 'সে এক বৃষ্টির রাত –'

* *

না থাক! আজ বাপ ব্যাটায় একা একা গল্প করুক। আমরা ওদের বিরক্ত করব না। সুতনু তো এখন মাসখানেক দেশেই থাকছে। একদিন ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ওর মুখেই গল্পটা শোনা যাবে খন। তারপর না হয় ঠিক করা যাবে কার গল্পটা বেশী রোম্যান্টিক।

[মার্চ ২৬, ১৯৯৯]

গণিতাঙ্গুলি

আই.আই.এস সি.-র ফ্যাকাল্টি হলে জাতীয় গণিত সম্মেলন হচ্ছে। মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক রুদ্রপ্রতাপন একটা থিয়োরেম প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। কেউ কিচ্ছু বুঝছে না। এমনিতেই থিয়োরেমটা বেশ শক্ত। সেটা প্রমাণ হলে দেড়শ বছরের পুরনো একটা কন্‌জেক্‌চার প্রমাণ হয়ে যায় যায় এমন অবস্থা। কিন্তু রুদ্রপ্রতাপনের গলার স্বর এতই মিহি আর জড়ানো এবং তার বাচনভঙ্গী এতই খারাপ যে ফ্যাকাল্টি হলের দুশ শ্রোতার কারোরই মাথায় কিছু ঢুকছে না। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কখন বারটা পঁয়তাল্লিশ বাজে, কারণ তার পরেই সংলগ্ন বিশাল হলঘরে এলাহি মধ্যাহ্নভোজনের বন্দোবস্ত রয়েছে। কেউ কেউ হাল ছেড়ে দিয়ে নরম গদি আঁটা চেয়ারে ঢলে পড়েছে – বেপরোয়া কয়েকজন আবার সশব্দে।

শুধু ব্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটির গণিতের ছাত্র সিগরকান্তি টান টান উত্তেজনায় রুদ্রপ্রতাপনের প্রতিটি শব্দ গিলছিল। তার বক্তৃতা যখন প্রায় শেষ তখন সিগরকান্তি হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার প্রমাণটা নির্ভুল। কিন্তু এটা প্রমাণ হলেই স্ত্রাসেনমান-এর কন্‌জেক্‌চার প্রমাণ হয়ে যায় না।" প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি স্ত্রাসেনমান ঊনবিংশ শতকের স্বনামধন্য জার্মান গণিতবিদ। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'গ্রুন্ট্‌বেগ্রিফা ডেয়ার মডার্নেন মাটেমাটিক' গ্রন্থে আধুনিক গণিতশাস্ত্রের এক নতুন শাখার জন্ম দিয়েছেন। বইটির শেষ অধ্যায়ে তিনি পাঁচটি স্টেটমেন্ট লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ধারণা এগুলো সত্যি। কিন্তু তিনি জীবদ্দশায় এগুলো প্রমাণ করে যেতে পারেন নি। এই শতাব্দীতে এই পাঁচটির চারটি প্রমাণ হয়ে গেছে। বাকী আছে একটি। রুদ্রপ্রতাপন দাবী করছে সে সেটা প্রমাণ করে ফেলেছে, আর সিগরকান্তি বলছে তা নাকি হয় নি।

এরপর পনেরো মিনিট ধরে রুদ্রপ্রতাপন আর সিগরকান্তির তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা চলল। সিগরকান্তি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল যে রুদ্রপ্রতাপনের প্রমাণটা অসম্পূর্ণ। কিন্তু রুদ্রপ্রতাপনের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারল না। দুজনেই যখন উত্তেজনার তুঙ্গে তখন সেই অধিবেশনের চেয়ার পারসন ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ব্যাপারটা আপনারা পরে মিটিয়ে নেবেন। একটা বেজে গেছে। এখন অধিবেশন ভঙ্গ হোক। ওদিকে মাশরুম সুপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

বিকেল পাঁচটায় কনফারেন্স শেষ হলে হয়সালা হাউসে রুদ্রপ্রতাপনের ঘরে দুজনে মিলিত হল। দুঘণ্টা ধরে সিগরকান্তি চেষ্টা চালিয়ে রুদ্রপ্রতাপনকে বোঝাতে পারল যে তার প্রমাণটা সত্যিই অসম্পূর্ণ। তারপর সিগরকান্তি বলল যে এই প্রমাণটার বাকী অংশটা সে করে ফেলেছে। শুধু ঐ প্রথম অংশটা যেটা রুদ্রপ্রতাপন প্রমাণ করেছে সেখানেই সে আটকে গিয়েছিল। আজ তাদের এই মণিকাঞ্চনযোগে গোটা প্রমাণটা ঠিকঠাক দাঁড়াল।

রাত সাড়ে বারোটার সময় সিগরকান্তি তার প্রমাণের অংশটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে ঠিক করল যে তারা অনতিবিলম্বে একটা পেপার লিখে একটা ভালো জার্নালে ছাপাবে। তারপর বাড়ী ফেরার জন্য বাইকে স্টার্ট দিয়ে সিগরকান্তি যখন রুদ্রপ্রতাপনকে বিদায় জানাতে হাত নাড়ল, তখনই রুদ্রপ্রতাপন প্রথম লক্ষ্য করল সিগরকান্তির বাঁহাতে ছটা আঙুল।

প্রথমদিকে রুদ্রপ্রতাপন ব্যাপারটাকে তেমন পাত্তা দেয় নি। কিন্তু ঘরে ফিরে হঠাৎই তার একটা কথা মাথায় এল। তাদের পরিবারে এমন একটা সংস্কার আছে যে এই বংশের কারোর যদি বাঁহাতে ছয় আঙুলওয়ালা কোনো লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তবে ভীষণ বিপদ। এই ছ আঙুলওয়ালা লোকটি তার সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনবে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও আছে। এই ছয় আঙুলওয়ালা লোকটিকে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে এই সর্বনাশ থেকে

বাঁচাতে পারে বাঁ হাতে ছয় আঙুলওয়ালা আর একটি লোক। আর এরকম কোন লোকের সঙ্গে যদি এক বছরের মধ্যে দেখা না হয় তবে ধ্বংস অনিবার্য।

রুদ্রপ্রতাপনের মনে হল, দূর ! এ শুধু সংস্কারই। এটাকে পাত্তা দেবার কোন মানেই হয় না। কিন্তু একটা তীব্র দুশ্চিন্তা তার ওপর ভর করল। সত্যিই তো, সিগরকান্তিকে সে কতটুকুই বা চেনে। সে যে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না তার স্থিরতা কোথায় ? কিন্তু, কিন্তু সিগরকান্তি তার কি ক্ষতি করতে পারে ? কিভাবে তাকে সমূলে বিনষ্ট করা সম্ভব ? হত্যা করা ? ওরে বাবা, সে অসম্ভব। ছাত্ররা অংক ভুল করলে রুদ্রপ্রতাপন তাদের নির্মম চিত্তে শূন্য দিতে পারে; তার নিষ্ঠুরতা মেরে কেটে ঐ অবধি। তাই বলে মানুষ খুন। অসম্ভব !

হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মত একটা চিন্তা রুদ্রপ্রতাপনের মাথায় খেলে গেল। ক্ষতির স্বরূপটা সে বুঝতে পারল। এটা ঠিক যে স্ত্রাসেনমানের কন্‌জেক্চার প্রমাণের পঞ্চাশ শতাংশ কৃতিত্ব তার, বাকী পঞ্চাশ শতাংশ সিগরকান্তির। না, রুদ্রপ্রতাপন একশ শতাংশ কৃতিত্ব নিজে নিতে চায় না। কিন্তু যে পঞ্চাশ শতাংশ কৃতিত্বটুকু তার প্রাপ্য সেটাকে সে বিসর্জন দিতে পারে না। রুদ্রপ্রতাপন যতই ভাবতে থাকল, ততই তার এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে সিগরকান্তি কোন না কোন ভাবে তার কৃতিত্ব খর্ব করতে চাইবে। তার প্রাপ্য সম্মানটুকু কেড়ে নেবে। তা হতে দেওয়া যায় না। অতএব সিগরকান্তিকে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে। কিন্তু কিভাবে ও কি অজুহাতে ?

অজুহাত একটা মিলে গেল পরের দিন। সকালবেলা ব্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাসে ওদের দেখা করার কথা ছিল। সেই মত রুদ্রপ্রতাপন সেখানে হাজির হল। সিগরকান্তি তাকে খাতির করে নিয়ে গেল তার রিসার্চ সুপারভাইজার শ্রীনিবাসুলুর ঘরে। আজ সকাল সকাল কলেজে এসে সিগরকান্তি তার গাইডকে সব কথাই বলেছে। শ্রীনিবাসুলু অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে রুদ্রপ্রতাপনকে আসন গ্রহণ করতে বলল। ঘণ্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে তিন কাপ কফির অর্ডার দিয়ে দিল। তারপর বলল, “আপনার সব কথা শুনেছি। আসুন, আমরা এখনই একটা পেপার লিখে ফেলি।”

রুদ্রপ্রতাপন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “আমরা মানে ?”

শ্রীনিবাসুলু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল, “আমরা মানে আপনি, আমি আর আমার ছাত্র।”

রুদ্রপ্রতাপন ঝাঁঝিয়ে উঠল, “সে রকম তো কথা ছিল না !”

এরপর একটা বিচ্ছিরি কথা কাটাকাটি চলল আধঘণ্টা ধরে। রুদ্রপ্রতাপনকে এটা বোঝানো গেল না যে একটা কালজয়ী কাজ দুজনের জায়গায় তিনজনের নামে ছাপালে মাথা পিছু কৃতিত্ব পঞ্চাশ শতাংশ থেকে তেত্রিশ শতাংশে নেমে যায় না। সকলেরই কৃতিত্ব থাকে একশ শতাংশ করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বিশেষ করে অন্য সময় হলে রুদ্রপ্রতাপন নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব মেনে নিত। কিন্তু এখন সিগরকান্তিকে জব্দ করাই তার মূল উদ্দেশ্য – নিজেকে এক অজানা সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবার তাগিদেই। শেষমেষ শ্রীনিবাসুলু বলল, “ঠিক আছে, আপনারা দুজনেই লিখুন। আমি সরে দাঁড়াচ্ছি।” কিন্তু সিগরকান্তি মেনে নিল না। তার বক্তব্য এই কাজের পিছনে তার গাইডের অবদান বিশাল এবং অনস্বীকার্য। তাকে বাদ দিয়ে পেপার লেখার প্রশ্নই ওঠে না।

তিন কাপ কফি তাদের উত্তাপটুকু তিনজন বিবাদমান মানুষের মধ্যে সঞ্চার করে কাপের মধ্যেই জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। ঝগড়ার কোন মীমাংসা হল না। রুদ্রপ্রতাপন এক সময় রেগেমেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেই সন্ধ্যেবেলাতেই মাদুরাই-এর

বাসে চেপে বসল। না, সে সিগরকান্তির সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না।

এরপর ছ মাস ধরে ব্যাঙ্গালোর – মাদুরাই চিঠি চালাচালি হল প্রচুর। রুদ্রপ্রতাপন এবং সিগরকান্তি দুজনেই তাদের জিদ বজায় রাখল। শেষে রুদ্রপ্রতাপন তার প্রমাণের অংশটুকু নিজের নামে লিখে এক জায়গায় পাঠাল। আর শ্রীনিবাসুলু ও সিগরকান্তি তাদের অংশটুকু লিখে আর এক জায়গায় পাঠাল।

দুটো পেপারই অসম্পূর্ণতার দায়ে বাতিল হল। তাছাড়া এটাও জানা গেল যে ঠিক মাসখানেক আগেই নাকি নেদারল্যান্ডের এরাসমুস উনিভার্সিটেইট থেকে জনৈক ফ্রান্‌ৎস্ বেকার অস্ট্রিয়ার একটা কনফারেন্সে স্ট্রাসেনমানের ফিফ্‌থ্ কন্‌জেক্‌চার-এর একটি সম্পূর্ণ প্রমাণ দিয়েছে।

এই ঘটনা শোনার পরে আমাদের গল্পের তিনজন কুশীলবের মানসিক অবস্থা কিরকম হল তা বর্ণনা করার মতন কলমের জোর আমার নেই। তার চেয়ে আসুন আমরা দেখি আরো ছয় মাস পরে কি হল।

প্রেক্ষাপট আবার আই.আই.এস সি.-র ফ্যাকাল্টি হল। গণিত সম্মেলন চলছে। এবারে আন্তর্জাতিক। অতিথি বক্তা ফ্রান্‌ৎস্ বেকার স্বয়ং। সে তার প্রমাণ সংক্ষেপে বলল। সবাই সাধুবাদ দিল। সিগরকান্তি, শ্রীনিবাসুলু আর রুদ্রপ্রতাপন তিনজনেই সভায় উপস্থিত। বিষণ্ন চিত্তে সব শুনল।

পরের দিন হোটেল রমণশ্রী কমফোর্টে বিশাল ব্যাংকুয়েট। খাবারদাবার ও নানারকম মদ্যের ছড়াছড়ি। শ্রীনিবাসুলু আজ মাত্র এক গ্লাস বিয়ার খেয়েছে। সে ভীষণ চিন্তিত। গম্ভীর মুখে এক কোণে একটা সোফায় বসে কি যেন ভাবছে।

অন্যদিকে সিগরকান্তি আর রুদ্রপ্রতাপন দুজনেই আজ অত্যধিক মদ্যপান করে ফেলেছে। সিগরকান্তি একটা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। মাথাটা ভীষণ ঝিমঝিম করছে। রুদ্রপ্রতাপন এক গেলাস রেড ওয়াইন নিয়ে তার সামনে দিয়ে আনমনে যাচ্ছিল। খেয়াল করে নি। সিগরকান্তির পায়ে হোঁচট খেল। তার হাত থেকে ওয়াইনের গ্লাসটা ছিটকে সিগরকান্তির জামাপ্যান্ট ভিজিয়ে কার্পেটের ওপর বেশ কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। সিগরকান্তি আচমকা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে রুদ্রপ্রতাপনের কলার চেপে ধরে বলল, "চোখ নেই না কি ?" রুদ্রপ্রতাপনও এই আকস্মিক আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "এখানে কেউ এভাবে পা ছড়িয়ে বসে থাকে ?"

তারপর সে প্রায় হাতাহাতি হবার যোগাড়। নেহাৎ চারপাশে প্রচুর লোকজন ছিল। ওদের শান্ত করল। এরই মধ্যে একজন লোক বোধ করি পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্যই সিগরকান্তিকে বলল, "ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার তো ! আপনার হাতেও ছটা আঙুল।" সিগরকান্তি বিরক্ত হয়ে বলল, "তাতে কি হল ?" লোকটি উত্তর দিল, "বেকারের হাতেও ছটা আঙুল, খেয়াল করেন নি ? আপনারই মতন বাঁ হাতে।"

রুদ্রপ্রতাপনের শিরদাঁড়ায় হঠাৎ একটা শিহরণ খেলে গেল। ব্যাকুল আগ্রহে সে জিগেস করল, "তাই নাকি ? কিন্তু বেকারকে তো দেখছি না।" একজন বলল, "না, কাল সকালেই জেরুজালেমে ওনার একটা টক্ আছে কি না। তাই উনি আজ বিকেলের ফ্লাইটেই চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন !" মাথা চেপে ধরে রুদ্রপ্রতাপন বসে পড়ল মাটিতে। অসম্ভব, অসম্ভব ! বেকারকে এতই ঈর্ষা করেছে রুদ্রপ্রতাপন যে তার ধারেকাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি। অথচ তারই বাঁ হাতে কিনা ছটা আঙুল ! অর্থাৎ সেই পারত তাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু সে চলে গেছে – চলে গেছে –

রুদ্রপ্রতাপনের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখে কর্মকর্তারা তাকে একটা বিশেষ গাড়ীতে করে আই.আই.এস সি.-র গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিল। শ্রীনিবাসুলু আর সিগরকান্তিও আর বেশীক্ষণ পার্টিতে থাকল না।

বেরিয়ে এসে শ্রীনিবাসুলু সিগরকান্তিকে বলল, "চল হে ! একবার রুদ্রপ্রতাপনকে দেখে আসি। ভদ্রলোকের কিছু সমস্যা আছে মনে হচ্ছে। আর রাগারাগি না করে সেটাকে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করা উচিত বোধহয়। তাছাড়া —"

গেস্ট হাউসে রুদ্রপ্রতাপনের ঘরে আলো জ্বলছিল। কিয়দ্ক্ষণ ডাকাডাকির পর দরজা খুলে বেরোল রুদ্রপ্রতাপন। তারপর সিগরকান্তিকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ তার হাত দুটো ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করা গেল। তারপর ধীরে ধীরে সে তার সব কথা খুলে বলল। সেই শুনে সিগরকান্তি বলল, "ছি ছি, আপনি একটা অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে এতো সব করলেন। ওটা তো একটা কুসংস্কার মাত্র। আপনি না বিজ্ঞানী। আপনি কি করে পারলেন এই সামান্য কারণে নিজের ও আমাদের এমন ক্ষতি করতে ? আপনি নিজেই বলুন এই সমস্ত কিছুর জন্য কে দায়ী। আমি, নাকি আমার হাতের একটা অতিরিক্ত আঙুল, নাকি আপনার অন্ধ সংস্কার ?"

রুদ্রপ্রতাপন আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, "আমি দুঃখিত। ভীষণ দুঃখিত। পারলে ক্ষমা কোরো।"

সিগরকান্তি দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। তারও ইচ্ছে হচ্ছিল গলা ছেড়ে কাঁদতে। কিন্তু পঁচিশ বছরের একটা যুবক কেমন করে তা করে ?

শ্রীনিবাসুলু হঠাৎ গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল, "ওহে, আপনারা শান্ত হন। আমি ভাবছি অন্য একটা কথা। আপনারাও তো বেকারের লেক্চার শুনলেন। কোথাও খট্কা লাগে নি ?"

"মানে ?" – অন্য দুজন শিরদাঁড়া সোজা করে বসল।

তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই রাত্রেই তিনজন প্রমাণ করল বেকারের প্রমাণও অসম্পূর্ণ, ওদের আগের সম্মিলিত প্রমাণ যেটাকে ওরা নির্ভুল মনে করেছিল সেটাও ছিল অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই দুটো প্রমাণ একসঙ্গে মেলালে একটা সম্পূর্ণ প্রমাণ খাড়া হচ্ছে। এতে এখন আর কোন সন্দেহই নেই।

স্ত্রাসেনমানের ফিফ্থ্ কন্জেক্চার আজ বি.আর.এস.এস. থিয়োরেম নামে জগদ্বিখ্যাত।

[এই কাহিনীতে বর্ণিত প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনাই কাল্পনিক।]

[সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৯৯]

ন্যাশনাল হাইওয়ে ৪

বাসটা ছাড়তে ছাড়তেই ঘণ্টা খানেক লেট করে ফেলল। তারপর বম্বের যানজট পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠতে না উঠতেই বাসস্থ লোকজন চেঁচামেচি শুরু করল ডিনারের জন্য বাস থামানোর দাবিতে। তখন রাত সাড়ে এগারটা বাজে। যাত্রীদের পেটে ছুঁচোরা ডন বৈঠক সেরে গা ঘামিয়ে নিয়ে শীর্ষাসন করতে শুরু করেছে। এদিকে এ.বি.সি. ট্র্যাভেলসের সঙ্গে সাগরসঙ্গম রেস্টুরেন্টের বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে। ড্রাইভার ও হেল্পারদের কাছে ওপর মহল থেকে কড়া নির্দেশ আছে যে রাত্রিভোজনের জন্য একমাত্র ঐখানেই বাস থামান যাবে। কিন্তু সে রেস্টুরেন্ট এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ। শেষমেষ নরম নরম প্রেমের গান চালিয়ে আর নানান ছুতোয় যাত্রীদের ভুলিয়ে বাসের ড্রাইভার এক ঘণ্টার পথ চল্লিশ মিনিটে অতিক্রম করে সাগরসঙ্গমের দ্বারসঙ্গমে এসে বাসটাকে দাঁড় করাল।

বিবস্বান্ ব্যানার্জী হাসি হাসি মুখে মজা দেখছিল। তার অবশ্য তেমন খিদে পায় নি। সন্ধ্যেবেলাই সে মামার বাড়ি থেকে প্রচুর খেয়ে বেরিয়েছে। বিবস্বান্ ব্যাঙ্গালোরে একটা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করে। হঠাৎই অফিসের কাজে তাকে বম্বে আসতে হল। কিন্তু ব্যাপারটা এতো দেরিতে ঠিক হল যে তখন আর ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেল না। অফিসে বিবস্বানের যে স্ট্যাটাস তাতে তাকে প্লেনভাড়া দিয়ে বম্বে ঘুরিয়ে আনতেও কোম্পানি নারাজ। অতএব দূরপাল্লার বাসেই যাওয়া ও ফেরা ঠিক হল। অফিসের কাজকর্ম মিটিয়ে বিবস্বান্ তার মামার বাড়িতে দুদিন কাটিয়ে ফেরার বাসে চেপে বসল।

অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বিবস্বান্ও সাগরসঙ্গমে ঢুকল। অল্প করে কিছু খাওয়া দাওয়া করল। তারপর এক গেলাস জল ঢক্ঢক্ করে খেয়ে তার মনে হল তার যেন পাচ্ছে। এমনিতে বিবস্বান্ বেশ নার্ভাস প্রকৃতির। তাছাড়া বাসে ভ্রমণের সময় যখন তখন পেয়ে গেলে যে কেউই ভড়কে যায়। বিবস্বান্ ভেবে দেখল সে যখন অল্প করেই খেয়েছে তখন তার হাতে কিছুটা সময় আছে। তাই সে তড়িঘড়ি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পাশের ল্যাট্রিনে ঢুকে পড়ল। তারপর অভীষ্ট কাজকর্ম সেরে যখন বাইরে এল তখন দেখল এ.বি.সি. ট্র্যাভেলসের হলুদ-কালো বাসটা চলে গেছে।

সর্বনাশ ! মাথায় হাত দিয়ে বিবস্বান্ বসে পড়ল। এক রাত্তির অপেক্ষা করে পরের দিন আর একটা বাস ধরে ফিরে যাওয়াই যায়। কিন্তু পার্সে হাত চালিয়ে বিবস্বান্ দেখল মাত্র আড়াইশ টাকা পড়ে আছে। বম্বে-ব্যাঙ্গালোরের বাসভাড়া চারশ টাকা। তার টাকা পয়সা ও যাবতীয় জিনিসপত্র সবই সে তার ব্যাগে পুরে তালাবন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু সেই ব্যাগটাই তো বাসে রয়ে গেছে। তাতে যে কয়েক হাজার টাকা, জামাকাপড় ও কিছু প্রসাধন সামগ্রী আছে, সেগুলো খোয়া গেলেও বিবস্বানের তেমন ক্ষতি নেই। কিন্তু তার সঙ্গে আছে অফিসের কিছু জরুরী নথিপত্র, তার পাশপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাঙ্কের পাশবই, গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি কিছু অমূল্য জিনিস। সেগুলোর কথা ভেবে বিবস্বান্ চোখে অন্ধকার দেখল। তার ওপর আবার তার মামা জার্মানীতে গিয়েছিল অফিসিয়াল ট্যুরে। সেখান থেকে বিবস্বান্ এবং তার মা, বাবা ও দিদির জন্য নানারকম উপহার কিনে এনেছে – ক্যামেরা, সি.ডি.প্লেয়ার, রূপোর তৈরি একটা সিগারেট কেস ইত্যাদি। সেগুলোও ব্যাগের মধ্যে ছিল। সেগুলোর আর্থিক মূল্যের চেয়েও মামার ভালোবাসার যে ছোঁয়া ছিল তাতে তার দাম অনেক বেশী। তদুপরি সেগুলোর বেশীর ভাগই তার মারফৎ অন্য লোকের কাছে পাঠানো হচ্ছিল। তাদের কি কৈফিয়ৎ দেবে বিবস্বান্ ?

নাঃ, ঐ বাসটাকেই ধরতে হবে। যেভাবেই হোক। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। আর কোনও দূরপাল্লার বাস চোখে পড়ছে না। প্রচুর লরি, ট্রাক আর কিছু মোটরগাড়ি সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিবস্বান্ ঠিক করে ফেলল একটা গাড়ি ধরে বাসের পিছু ধাওয়া করবে। কিন্তু হাইওয়েতে বাসের যা স্পীড লরি বা ট্রাকের স্পীড তার ধারে কাছে আসে না। একমাত্র জিপ বা কার-জাতীয় গাড়িই পারে তাকে বাস অবধি পৌঁছে দিতে। এই ভেবে সে একের পর এক মোটরগাড়িকে থামানোর জন্য উঠে পড়ে লাগল। খান তিনেক দাঁড় করাতে পারল। কিন্তু তারা কেউই ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছে না – যাচ্ছে পুনে, সাতারা, কোল্হাপুর ইত্যাদি কাছাকাছি জায়গায়। সেসব জায়গায় পৌঁছোবার আগেই যে বাসটাকে ধরা যাবে এমন নিশ্চয়তা কই ?

হতাশ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে বিবস্বান্ রাস্তায় বসে পড়ল। তার বারবার মনে হতে লাগল তার বোধহয় আবার পাচ্ছে। কিন্তু এখন সময় নেই। যা করার এখনই করতে হবে।

হঠাৎই বিবস্বানের কানে গেল বিকট শব্দ করে একটা গাড়ি আসছে। তাকিয়ে দেখল সেটা একটা টাটা সিয়েরা। ঐ বিকট শব্দটা অবশ্য গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ নয়। ডিপ্ পার্পলের রক সঙ্গীত। বিবস্বান্ মরিয়া হয়ে সেটাকেও হাত পা নেড়ে থামতে বলল। এবং বলা মাত্রই রকমূর্ছিত গাড়িটা প্যাঁক করে ব্রেকের শব্দ তুলে তার পাশে এসে কেত্রে দাঁড়াল। তারপর গাড়িটার সামনের জানলা থেকে একটা রোদচশমা পরা মুখ উঁকি মারল। ক্যাসেটের শব্দ থেমে গেল। রোদচশমাধারী গোঁফের ফাঁক দিয়ে প্রশ্ন করল, 'এন্ বেকু ?'

আনন্দে বিবস্বানের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। সে অল্প অল্প কানাড়া ভাষা বোঝে। রোদচশমাধারীর মুখে কানাড়া শুনে সে ধরে নিল এরা নির্ঘাত ব্যাঙ্গালোরে যাবে। সে এক নিঃশ্বাসে হিন্দি-কানাড়া-ইংরিজী মিশিয়ে তার মর্মন্তুদ অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করল।

দেখা গেল বাস্তবিকই ওরা ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছে। কিন্তু গাড়িতে তখনই ছজন। টাটা সিয়েরায় এর থেকে বেশী লোক ধরা মুশকিল। বিবস্বান্ কাঁদো কাঁদো গলায় অনুরোধ করল যা হোক একটা ব্যবস্থা করার। তখন জুলপিধারী ড্রাইভার বলল ডিকিতে জায়গা হওয়া সম্ভব। বিবস্বান্ এককথায় রাজি। তখন এক কানে ও দু কানে দুল পরা দুটো ছেলে নেমে এসে ডিকি খুলে সেখান থেকে পিস্বোর্ডের একটা বিশাল বাক্স বের করে চালকের পাশে রাখল। আর বিবস্বান্ও গুটিসুটি মেরে ডিকিতে গিয়ে সিঁধোল। ঠিক তখনই একটা বাচ্ছা ভিখিরি এসে মারাঠী ভাষায় কি সব বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল আর বিবস্বানের জামা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। বিবস্বান্ চিনতে পারল বাস থেকে নেমে একেই সে পাঁচ টাকা দিয়েছে। এর এখন দাবি কি ? এ কি আরও ভিক্ষে চায় না কি ? বিবস্বান্ ভীষণ দাবড়ে দিল ভিখিরিটাকে। আর এক কানে দুলঅলা ছেলেটা জোর করে ডিকির দরজা বন্ধ করে দিল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

একে একে সকলের সঙ্গে বিবস্বানের পরিচয় হল। জুলপিধারি গাড়িচালকের নাম ভিজেয়, রোদ চশমার নাম রভি, এক কানে দুল হল ভেঙ্কি, দু কানে দুল হল বব। বাকি দুজনের একজন পনি টেল, তার নাম শ্রীনি। আর ষষ্ঠজন যার চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে কোনও আধুনিক উপসর্গ নেই তার নাম রাকেশ। এদের বয়স আঠেরো থেকে বাইশের মধ্যে। এরা সবাই ব্যাঙ্গালোরের স্থায়ী বাসিন্দা। গোয়া-পুনা-বম্বে প্রমোদসফর সেরে বাড়ি ফিরছে।

গাড়িতে উঠে বিবস্বান্ আবিষ্কার করল এরা সবাই মদ খাচ্ছে। মায় যে চালাচ্ছে সে পর্যন্ত। বিবস্বান্ প্রাণ হাতে করে বসে রইল। তাকেও মদ খেতে অনুরোধ করা হলে সে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করল। এখন তার একমাত্র মোক্ষ হলুদ-

কালো রঙের এ.বি.সি. ট্র্যাভেলসের ছাপমারা একটা বাস। সে অধীর আগ্রহে ডিকির মধ্যে থেকে রাস্তা পর্যবেক্ষণ করে চলল কখন সেই যানটির সাক্ষাৎ মেলে।

এদিকে ভেঙ্কি, ভিজেয় আর বব পালা করে গাড়ি চালাতে লাগল। মালের নেশা যত চড়তে থাকল, গাড়ির স্পীডও তত বাড়তে লাগল। বিবস্বানের টেনশানও বেড়ে চলল। বম্বে-পুনে-ব্যাঙ্গালোর হাইওয়েতে দুবার পশ্চিমঘাট ক্রশ করতে হয়। সেখানে মাঝে মাঝে রাস্তা বেজায় খাড়া। কখনও কখনও রাস্তার ধারে বিশাল খাদ। তার ধার ঘেঁষে বিপজ্জনক সব বাঁক নিতে নিতে টাটা সিয়েরাটা এগিয়ে চলল। হলুদ-কালো বাসের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।

রাস্তায় বার চারেক গাড়ি দাঁড়াল। দুবার যানজটে। আর দুবার মাতালদের প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দেবার তাগিদে। যত সময় বাড়তে থাকল, বিবস্বানের টেনশানও তত চড়তে থাকল। হলুদ-কালো গাড়ির দেখা যে কিছুতেই মেলে না!

একে একে মাতালরা সব ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু বব জেগে রইল গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে। তার দুচোখ তখন টকটকে লাল। কিন্তু অ্যাক্‌সিলারেটরের ওপর কোনও মায়াদয়া নেই। গাড়িটা একের পর এক লরি, ট্রাক ও অন্যান্য বাস ওভারটেক করতে করতে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল।

ওরা যখন সবে পুনে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে তখন একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়ল গাড়িটা। ওদের ঠিক সামনে দিয়ে একটা মালবোঝাই লরি যাচ্ছিল। বব অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিল ওটাকে ওভারটেক করার। কিন্তু উল্টোদিক থেকে স্রোতের মতন গাড়ি আসছিল বলে সুযোগ মিলছিল না। হঠাৎই সেই স্রোতের মধ্যে থেকে একটা বিশাল চেহারার ট্রাক লরিটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা ছোট ঘষটানি দিয়ে গেল। টালমাটাল হয়ে লরিটা সামলে নিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে তার ক্যারিয়ার থেকে দড়ি ছিঁড়ে তেরপল উড়ে গিয়ে রাশি রাশি টম্যাটো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। স্টিয়ারিং হাতে বব দেখল হঠাৎই তার গাড়ির সামনে টম্যাটোর সমুদ্র। প্রাণপণ শক্তিতে সে ব্রেক কষল। আর বাঁদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সেই সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেতে গিয়ে রাস্তা থেকে পাশের বালিজমিতে নেমে পড়ল আর একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মেরে থামল।

মাতালদের সাধারণতঃ ব্যথা লাগে না। যদিও টাটা সিয়েরাটা খুব জোরে গাছে ধাক্কা মারে নি, তবুও কার কোথায় লাগল বলা মুশকিল। শুধু এইটুকুই দেখা গেল পেটে স্টিয়ারিং-এর খোঁচা খেয়ে বব বমি করতে শুরু করেছে। আর একটা মালের বোতল পায়ে পড়ে রাকেশের পা কেটে গেছে। বাকিরা সবাই ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মেলে তাকিয়ে 'ও শিট্' বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বিবস্বান্‌ও কাঁধে একটা ধাক্কা খেয়েছিল, কিন্তু সেটা এমন কিছুই নয়। সে তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে বেরিয়ে মাতালদের শুশ্রূষায় নেমে পড়ল। এবং অচিরেই বুঝতে পারল এদের কারোরই বিশেষ কিছু হয় নি। ববকে মুখে চোখে জল দিয়ে ডিকিতে শুইয়ে দিল আর রাকেশের পায়ের আঙুলে রুমাল দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। গাড়ির চোটটাও তেমন মারাত্মক নয়, একটা হেডলাইটের কাচ ভেঙেছে মাত্র।

কিন্তু অতঃ কিম্? হলুদ-কালো বাস এখনও কত আগে দৌড়চ্ছে কে জানে! বিবস্বান্ গাড়ি চালাতে পারে বটে, কিন্তু হাইওয়ে দিয়ে কখনও গাড়ি চালায় নি এবং এর আগে কখনই কোনো লং ড্রাইভিং করে নি। তার ওপর তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বাসে পড়ে আছে। কিন্তু এখন সে অন্য গাড়িই বা পাবে কোথায়? তাছাড়া এই মাতাল ছেলেগুলোকে রাস্তায় এভাবে ফেলে রেখে যেতেও তার মায়া লাগল। তাই আর সাত পাঁচ না ভেবে সে নিজেই স্টিয়ারিং ধরে বসল।

তারপর সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! হলিউডের নায়করা যেমন পুলিস আর খল নায়কদের পশ্চাদ্ধাবন ও মুহুর্মুহুঃ গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে গাড়ি চালিয়ে সাঁত সাঁত করে এগিয়ে যায়, তেমনই বিবস্বান্‌ও এপাশ ওপাশ দুপাশের ট্র্যাফিককে

নির্দ্বিধায় কাটিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলল। সে নিজেও জানত না তার পক্ষে এরকম গতিতে ও ক্ষিপ্রতায় গাড়ি চালানো সম্ভব ছিল। কিন্তু সেই অভীষ্ট হলুদ-কালো বাসের দেখাই মিলল না।

সকালবেলায় মাতালদের ঘুম ভাঙল। তারা একবাক্যে বিবস্বানের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করল। তার গাড়ি চালানোর প্রশংসাও করল প্রচুর। তারপর সবাই মিলেমিশে গাড়ি চালিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ এ.বি.সি. ট্র্যাভেলসের অফিসে এসে পৌঁছল। এসে শুনল হলুদ-কালো বাস তখনও এসে পৌঁছয় নি। শুধু তাই নয়, রাত নটা দশটার আগে তার আসার কথাও নয়। তা হলে ? কোথায় হারিয়ে গেল বাসটা ? পথে বিবস্বান্ কোনও হলুদ-কালো রঙের বাস দেখে নি। সাদা, কালো, সবুজ, নীল, বেগুনী ইত্যাদি অজস্র বাস দেখেছে, কিন্তু ঐ বাসটা নয়। বস্তুতঃ ঐরকম বিচিত্র হলুদ-কালো ডোরাকাটা বাস সে জীবনে আর কখনও দেখেছে কি না সন্দেহ। কাজেই রাস্তায় একে চিনতে না পারার কোনও উপায়ই নেই। শুধু রাস্তাই নয়, সে পথের পাশের প্রতিটি ধাবা, দোকান ও রেস্টুরেন্ট খুঁটিয়ে দেখেছে। কোথাও সেই কুখ্যাত বাস তার চোখে পড়ে নি। বিবস্বান্ জানে যে এই রুটে বম্বে থেকে ব্যাঙ্গালোর আসতে এই ধরণের দূরপাল্লার বাসগুলো সচরাচর চব্বিশ ঘণ্টার কম সময় নেয় না। সে উত্তেজনা বশে ভীষণ গতিতে গাড়ি চালিয়েছে বলেই এত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পেরেছে। অতএব সে নিশ্চয়ই বাসটাকে কোথাও ক্রশ করেছে রাস্তায়। কিন্তু তা কি করেই বা সম্ভব ? এত বড় দেখার ভুল বিবস্বানের হতে পারে না।

বিবস্বান্ উৎকণ্ঠিত চিত্তে এ.বি.সি. ট্র্যাভেলসের অফিসে অপেক্ষা করতে লাগল। রাত সাড়ে দশটায় বাসটা এল। বিবস্বান্ সঙ্গে সঙ্গে কন্ডাক্টর ও ড্রাইভারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কন্ডাক্টর জিভ কেটে বলল, 'আরে স্যার, আপনিই সেই এগার নম্বর সিটের প্যাসেঞ্জার তো ?' বিবস্বান্ তেড়েফুঁড়ে বলল, 'এর মানে কি ? আপনাদের একটা দায়িত্ববোধ নেই ? সবাই বাসে উঠল কি না দেখেই আপনারা বাস ছেড়ে দিলেন !' কন্ডাক্টর তাকে থামিয়ে দিয়ে বল, 'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান। শান্ত হন। আমরা বাস ছেড়ে দিই নি। আপনারা তখন ডিনারের জন্য এমন চেঁচামেচি জুড়েছিলেন যে আপনাদের তাড়াহুড়ো করে রেস্টুরেন্টে নামিয়ে দিয়ে আমরা একটু ব্যাক করে একটা জায়গায় তেল ভরতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি এই অবস্থা। একটা ভিখিরি বলল আপনি নাকি একটা গাড়ি ধরে চলে গেছেন। আর আপনার আক্কেলটাই বা কি ? রেস্টুরেন্টের ধারে কাছে বাকি সব যাত্রীরাই তো অপেক্ষা করছিল। তাদের দেখে তো আপনার বোঝা উচিত ছিল। তাছাড়া ভিখিরিটাও আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিল। আপনি কিছুই দেখলেন না, শুনলেন না, আর এখন আমাদের দোষ দিচ্ছেন ! যাই হোক, একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আমাদের তরফে কিছু দোষ থেকে থাকে তো ক্ষমা করবেন। আর এই নিন আপনার ব্যাগ। হেল্পার যত্ন করে গুছিয়ে রেখে দিয়েছে।'

বিবস্বান্ খুবই অপ্রস্তুত হয়ে মাথাটাথা চুলকে বলল, 'ইয়ে, মানে, তাই না কি ? ধন্যবাদ ! কিন্তু, হল গিয়ে, কাছে পিঠে কোনও টয়লেট আছে কি ?' তার আবার পাচ্ছে।

[এপ্রিল ১১, ২০০০]

সমীকরণ-অসমীকরণ

'ছেলেটা কি ভেড়া ছিল কি বলব !' এইটুকু বলেই ইনা হাসিতে ফেটে পড়ল। মৌ উদ্‌গ্রীব গল্পটা শোনার জন্য। বলল, 'কি হয়েছিল বলবি তো !' হাসি থামিয়ে ইনা বলতে শুরু করল, 'সে এক কাণ্ড। আমি তখন সবে এখানে এসেছি। কদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম ছেলেটা আমার দিকে কেমন জুলজুল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর একদিন রাতে মেসে খাচ্ছিলাম। ছেলেটা এসে ঠিক আমার উল্টোদিকে বসল। এদিকে আমার পাশে ছিল কবরী। ওকে বললাম ভাতটা এগিয়ে দিতে। ভাতের পাত্রটা কবরীর হাতের নাগালের মধ্যেই ছিল। কিন্তু কবরী কিছু করার আগেই ছেলেটা তড়িঘড়ি পাত্রটা আমার দিকে বাড়াতে গিয়ে জলটল উল্টে সে যা এক কাণ্ড করল।'

টিউ বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও এই কথা —"। ইনা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে, বাকিটা শোনই না। ছেলেটার আচরণে আমার ভীষণ মজা লাগত। ওকে দেখলেই আমার কেমন হাসি পেয়ে যেত। একদিন ভাবলাম ওকে একটু টিজ করি। একদিন কফি বোর্ডে গিয়ে দেখি ছেলেটা একটা টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে আর চোরা চাউনিতে আমাকেই দেখছে। আমি সোজা গিয়ে ওর পাশে বসলাম আর গম্ভীর গলায় বললাম, "মশাইয়ের কিছু বক্তব্য আছে নাকি ? অমন ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকা হচ্ছে যে।" ছেলেটা তখন যা করল – বিষম খেয়ে, কেশে টেশে, কফি চলকিয়ে – ওঃ ভাবলেই হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়। তারপর কোনক্রমে সাম্‌লে নিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, "না, মানে বলার নেই তো কিছু।" বলেই দুদ্দাড়িয়ে পালিয়ে গেল। তারপর থেকে ছেলেটা আমার সঙ্গে দেখা হলেই মাথা নিচু করে অন্যদিকে চলে যেত। একে ভেড়া ছাড়া কি বলব তোরাই বল।'

চার বন্ধু লেডিজ হোস্টেলের ছাদে জোর গল্প জুড়েছে – ইনা, মৌ, টিউ আর মঞ্জুষা। এদের চারজনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব। রোজ রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর এক ঘণ্টা ধরে জোর কদমে একটা ভাট না মারলে ওদের কারোরই যেন ঘুম আসতে চায় না। ইনার মতে একে নাকি ছেলেরা বলে থাকে 'পরনিন্দা পরচর্চা', আর মেয়েদের কাছে এটা নাকি নেহাতই 'সামাজিক আলোচনা'। চারজনেই এবার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ্ সায়েন্সে মাস্টারস বা পি.এইচ.ডি. করতে ঢুকেছে। সবাই আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টের। কিন্তু একই হোস্টেলে থাকতে থাকতে ওদের বেজায় ভাব হয়ে গেছে।

টিউ এবার তার নিজের কাহিনী বলতে শুরু করল, 'আমি তখন যাদবপুরে পড়ি, বুঝলি তো। রোজ কলেজ থেকে ফেরার সময় দেখতাম মোড়ের পান-সিগারেটের দোকানটার সামনে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে থাকত। আর নির্লজ্জের মত আমাকে দেখত। চোখে চোখ পড়ে গেলেও চোখ সরাত না। কি ভীষণ মুশ্‌কো টাইপের চেহারা ছিল ছেলেটার। আর চোখগুলো কেমন টকটকে লাল। তা প্রথম প্রথম আমি ব্যাপারটা তেমন পাত্তা দিই নি। পরে পাড়ার বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম ও নাকি এলাকার উঠতি মস্তান। তখনই নাকি দু তিনটে খুন করে ফেলেছে। বুঝলি ! সেই শুনে তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে শুরু করলাম। তারপর একদিন থেকে ছেলেটাকে দেখতে পেলাম না। খবর পেলাম পুলিসে নাকি ধরে নিয়ে গেছে। তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর তো এখানে চলে এলাম। কি জানি মস্তানটার কি হল।'

ইনা বিস্মিত হবার ভান করে বলল, 'ও বাবা, জোর বাঁচা বেঁচে গেছিস তো তাহলে। যদি একদিন সুযোগ বুঝে অ্যাটাক করত বা অ্যাবডাক্ট করে নিয়ে যেত —'

মৌ বলে উঠল, ‘করত নিশ্চয়ই। ভাগ্যিস বেশি সময় পায় নি।’

ইনা মন্তব্য করল, ‘ছেলেগুলো যে কেন এত হ্যাংলা হয় বুঝি না। মেয়ে দেখল তো —’

মৌ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘তা যা বলেছিস ভাই। আমি একবার একটা লোকের হ্যাংলাপনার শিকার হয়েছিলাম। সে আমাদের ফিজিক্স ল্যাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। আমাদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস থাকলেই ও আমাদের গ্রুপটার পাশে এসে ছিনে জোঁকের মত আটকে যেত। যেন আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমার থেকে ওর মাথাব্যথা বেশী। তা একদিন এক্সপেরিমেন্টটা কিছুতেই নামতে চাইছিল না। এমনকি অ্যাসিস্ট্যান্টবাবুর অকৃত্রিম সাহায্য সত্ত্বেও। শীতের সময় ছিল তখন, তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যেত। মাঝে হঠাৎই লোড শেডিং হয়ে গেল। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। সেইসময় লোকটা একটা অভদ্র আচরণ করেছিল। হয়তো দেখাতে চেয়েছিল অন্ধকারে ভুল করে হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম তা নয়। সবই ঐ যাকে বলে হ্যাংলামি।’

‘তুই কি করলি তখন ?’ মৌ জানতে ব্যগ্র।

‘অনেক কিছুই করতে পারতাম। নিদেনপক্ষে চেঁচামেচি জুড়তে পারতাম। কিছুই করি নি। তারপরই আলো চলে এল। এক্সপেরিমেন্ট শেষ করে আমি ইচ্ছে করেই সবার শেষে বেরোচ্ছিলাম। দেখলাম লোকটা হাসি হাসি মুখে গদগদ ভাবে আমাকে কি একটা বলতে আসছে। ঘরে তখন কেউ ছিল না। সেই সুযোগে ঠাটিয়ে একটা থাপ্পড় মারলাম বেটাকে। তারপর থেকে বেটা আর কোনও অসভ্যতা করে নি। এমনকি আমাদের গ্রুপের ধারেকাছেও আর আসত না।’

এমনি করে ওরা অনেকক্ষণ গল্প করল। নারীত্বের অহঙ্কারে স্পর্ধিত, নব যৌবনের স্পর্শে উদ্ধত সেইসব গল্প। দেখা গেল অভিজ্ঞতার ঝুলি ওদের প্রত্যেকেরই অফুরন্ত। ওরা এও আলোচনা করল কত কত ছেলেরা সব ওদের প্রোপোজ করে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছে। একের পর এক উদাহরণের বন্যা বয়ে গেল আবার।

হঠাৎই ইনা আবিষ্কার করল মঞ্জুষা এতক্ষণ একটাও কথা বলে নি। ইনা জিগেস করল, ‘কি রে মঞ্জু, এত চুপচাপ কেন ? তোর জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে নি ? ছেলেরা তোকে প্রোপোজ করে নি ? কিছু বল।’

মঞ্জুষা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, ‘না রে। আমি কি আর তোদের মত সুন্দরী ? আমাকে আর কে প্রোপোজ করবে বল ?’

বাকি তিনজন জানে যে মঞ্জুষা যা বলছে তা সত্য। কারণ মঞ্জুষার রঙটা কালোর দিকে, হাইট বড়ই কম, দাঁত উঁচু, তার উপর আবার চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ওর প্রতি সত্যই ছেলেরা কেন আকৃষ্ট হবে ? কিন্তু সে কথা তো মুখে বলা যায় না। তাই টিউ সহানুভূতির সুরে বলল, ‘বুঝলি ! ওটা তোর কমপ্লেক্স। আসলে —’

‘না, কমপ্লেক্স কিছুই নয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত সিম্প্‌ল্‌ —’

এরপর সবাই মঞ্জুষাকে বোঝানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই হল না। মোটের উপর ফল এই দাঁড়াল যে ওদের ‘সামাজিক আলোচনা’য় সেদিন যবনিকা পড়ল।

* *

কয়েক দিন পর। রাত্রিবেলা ইন্সটিটিউটের একটা কাফেটেরিয়াতে চার বান্ধবী দিনের শেষ চা গলাধঃকরণ করছিল। কোত্থেকে হঠাৎ অরণি হাজির হল। সঙ্গে একটি মেয়ে। একটু ইতস্ততঃ করে অরণি জানাল, 'বিয়ে করে ফেললাম। এ আমার বউ, পঞ্চালিকা।' পাশের মেয়েটি ম্লান একটু হাসল।

চারজনেই বিস্ময়ে হতবাক্। অরণি বিয়ে করেছে এ কথা কেউই জানত না। তাছাড়া মেয়েটাও যেন অরণির বউ হিসেবে বড়ই বেমানান।

ইনা ওদের মধ্যে সবচেয়ে চট্‌পটে। সেই মৌনতা ভাঙল প্রথমে, 'ওমা তাই নাকি ? কবে বিয়ে করলি রে ? কিছু জানাস নি কেন আগে ? নেমন্তন্নের খরচ বাঁচাবি বলে ?'

অরণি অপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, 'সেরকম না একেবারেই। আসলে হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল বিয়েটা। বাড়িতে থাকতে থাকতেই। তাই জানানো যায় নি। আজই ফিরেছি ব্যাঙ্গালোরে। ঠিক আছে, আসছে মাসে একদিন সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করা যাবে খন।'

টিউয়ের ঠোঁটটা একটু কাটা। সে হঠাৎ বলে বসল, 'লাভ ম্যারেজ নাকি রে ?'

অরণি একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সে ক্যালি কি আর আমার আছে ?'

* *

হোস্টেলে ফেরার পথে চার রমণীকে যেন একটু গম্ভীর দেখাল। ছাদে ওদের রাত্রিকালীন আড্ডাটা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু তখন ওরা সকলেই মনে করল ওদের বোধহয় আরও কিছু আলোচনা করার আছে। তাই ছাদে ফের সমবেত হল ওরা।

টিউ প্রথম মুখ খুলল, 'কি বুঝলি ?' মৌ সংক্ষেপে সারল, 'বুঝলাম না ! বেশ জটিল কেস।' ইনা মন্তব্য রাখল, 'কি ভীষণ মুটকি !' মৌ: 'নাকটা বোঁচা। প্যাঁচার মত মুখ।' টিউ: 'রঙটাও কেমন অ্যানিমিয়া রুগীর মত ফ্যাটফ্যাটে।' ইনা: 'অরণির পাশে মানায় ওকে ? তোরাই বল।' মৌ: 'সে কথাই তো এতক্ষণ বলছি।' টিউ: 'হুম্। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ রে, অ্যারেঞ্জ্‌ড্ ম্যারেজ বলল না ?' মৌ: 'হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু দেশে কি মেয়ের অভাব ঘটেছে ?' ইনা: 'ইউ মীন সুন্দরী মেয়ের।' মৌ: 'অফ্ কোর্স। একটা পেত্নীকে বিয়ে করে বসল শেষটায়। ছ্যা ছ্যা।' টিউ: 'আমরাও তো ছিলাম, না কি ?' ইনা: 'ঠিক বলেছিস, প্রোপোজ করতেও পারত তো !' মৌ: 'তা না করে শেষটায় —'

মঞ্জুষা এই প্রথম মুখ খুলল, 'প্রোপোজ করলে তোরা অ্যাক্সেপ্ট করতিস ? নাকি বলতিস, "এ বাবা এও হ্যাংলা জানতাম না তো"।'

ইনা বলল, 'না মানে, দ্যাট্ ডিপেন্ড্‌স্।' মঞ্জুষা: 'অন হোয়াট্ ?' ইনা: 'অন অন – মে বি, দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড অ্যান্ড লট্‌স্ অফ্ আদার থিংস্ —'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। মঞ্জুষা দ্বিতীয় ক্ষেপণাস্ত্রটা ছুড়ল, 'ও কিন্তু আমাকে প্রোপোজ করেছিল।' আঘাতটা সাম্‌লাতে তিনজনের ফের কিছু সময় লাগল। অরণি মঞ্জুষাকে প্রোপোজ করল, মানে করতে পারল ! অরণির বউকে যদি বা মেনে নেওয়া যায়, তাই বলে মঞ্জুষাকে। অসম্ভব ! অরণির বাছবিচারের কোনও ক্ষমতা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

টিউ হঠাৎ বলে ফেলল, 'অরণি তোকে প্রোপোজ করল, অ্যাঁ ?'

মঞ্জুষা একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, 'আশ্চর্য হচ্ছিস, তাই না ? কিন্তু ঘটনাটা সত্যি।'

ইনা প্রবল দ্বিধায় জিগেস করল, 'তুই, তুই কি করলি ?'

মঞ্জুষার গলাটা ধরে এল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'ফিরিয়ে দিলাম।'

টিউয়ের বিস্ময় কাটতে চায় না, ও বলল, 'ফিরিয়ে দিলি ! অরণিকে তুই ফিরিয়ে দিলি ! অত সুন্দর ছেলেটা —'

'ঠিক সেই কারণেই ফিরিয়ে দিলাম। অরণি বড় সুন্দর, বড়ই — ও আমার মধ্যে কি দেখেছিল জানি না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম এই ব্যাপারটা আর বেশী দূর না গড়ানোই ভাল। আমি কিছুতেই নিজেকে অরণির পাশে দাঁড় করাতে পারলাম না। আসলে আমি ভয় পেলাম। যদি — নাঃ, আমি যতটা ভাবি, ততটা কুচ্ছিত হয়ত আমি নই। কিন্তু অরণির পাশে দাঁড়াবার মত সুন্দরীর অভাব নেই। অ্যাট্ লিস্ট্ তোরাই তো ছিলি !'

মঞ্জুষা হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। বাকিরা এতই বিস্মিত যে কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেল না। মঞ্জুষা নিজেই সাম্‌লে নিল। তারপর বলল, 'দ্যাখ্, তোরা সেদিন ছেলেদের হ্যাংলা বলছিলি। আসলে আমি বলি কি মানুষ মাত্রই সৌন্দর্যের পূজারী। ছেলে মেয়ে সবাই। তোরাই তো আজ বললি অরণি তোদের কাছে না এসে কেন আমাকে প্রোপোজ করল আর পঞ্চালিকাকে বিয়ে করল। ঠিক কি না ?'

অন্যরা প্রতিবাদ করল, 'না, আমরা তো একবারও বলি নি অরণির প্রতি আমাদের কোনও সফ্ট্ কর্নার ছিল, বা আছে।'

'না বলিস নি। কিন্তু তোদের কথায় যে জেলাসি ছিল তা তোরা অস্বীকার করতে পারিস ? আসলে অস্বীকার করার মানেও হয় না। বললাম না মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্যের পূজারী।'

* *

তারপর বারো বছর কেটে গেছে। ইনা, টিউ আর মৌ তিনজনেই বিয়ে করেছে। ইনার দুঃখ ওর কোন ছেলেপুলে হচ্ছে না বলে। আর টিউ তার এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে এতই ব্যস্ত যে নিজের কথা ভাবার সময়ই পায় না। মৌ ওদের দুজনের মতই লাভ ম্যারেজ করেছিল। কিন্তু এখন ওর ডাইভোর্সের মামলা চলছে। বিয়ের দু তিন বছর পর থেকেই ওর জীবনটা কেমন বদলে গেল যার অন্তিম ফলশ্রুতি এই বিবাহবিচ্ছেদের মামলা। ও নিজেই ফাইল করেছে।

অরণি প্রথম বিবাহবার্ষিকীর রাতে পঞ্চালিকাকে বলে ফেলল মঞ্জুষার কথা। পঞ্চালিকা রাগের ভান করে বলল, 'কোন রাক্ষসীটা গো ?' অরণি বলল, 'ঐ একটু কালো করে —'। পঞ্চালিকা মুখ বিকৃত করে বলল, 'ওরে বাবা ঐ শাকচুন্নীটা। তোমার যে কি নজর !' অরণি একটু হাসল। তারপর বলল, 'জানি না, ওর মধ্যে আমি কি দেখেছিলাম। কিন্তু ওর প্রেমে একসময় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। প্রোপোজও করেছিলাম। ও রিফিউজ্ করল। তারপর বাড়িতে এসে সে এক কাণ্ড জুড়লাম – ঘ্যানঘ্যান, কান্নাকাটি, মায় আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত। তাই তো বাবা-মা তড়িঘড়ি তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল একরকম জোর করেই। সে এক দিক দিয়ে ভালই হল, কি বল ?'

এখন অরণি শুধুই টাকা রোজগারের পিছনে ছুটছে। বউ, সংসার, ওদের পাঁচ বছরের মেয়ে সায়ন্তনী, কাউকে দেবার মত এতটুকু সময় ওর নেই। পঞ্চালিকা অসুখী, ভীষণ অসুখী।

মঞ্জুষা বিয়ে করে নি, একাই থাকে। ও বুঝতে পারে না ও ভাল আছে না খারাপ আছে। ঠিক যেমন ও হিসেব মেলাতে পারে না অরণিকে ফিরিয়ে দিয়ে সেদিন ও ঠিক করেছিল না ভুল করেছিল।

কেউই বোধহয় সুখী নয়। মানুষ কি সুখী হতে পারে ? ওরা কেউই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় নি। তবে ওরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে ওদের ফেলে আসা প্রথম যৌবনের সেই রঙীন দিনগুলো বড়ই সুন্দর ছিল, বড়ই মধুর ছিল।

[সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০০]

খিচুড়ি

একটা কিম্ভূতকিমাকার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে প্রোফেসর ডক্টর তরুময় বাগচী একটু মেখে ছিল। আজ সকালেই সে একটা সিস্টেমকে নতুনভাবে মডেল করতে গিয়ে এই ইকুয়েশনটা পেল আর বোর্ডে খসখস করে সেটা লিখে ফেলল। তারপর অনেকক্ষণ নানারকম সাবস্টিটিউশন করে ওটাকে চেনা ফর্মে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। ভাবল একবার হুবার্টকে ফোন করা যাক। তারপর মনে হল, আর একটু ভেবে দেখি, তারপর।

ঠিক সেই সময় দরজার কাছ থেকে একটা ডাক এল, 'ট্যারাদা, চিনতে পারছ?' তরুময়ের সম্বিৎ ফিরল। মনে পড়ল, আজই তো কুসুমকীর্ণ করের আসার কথা। গতকালই তরুময়ের সেক্রেটারির সঙ্গে ফোন করে ঠিক হয়েছে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। চিন্তায় ছেদ পড়ায় তরুময় একটু বিরক্ত হল। কিন্তু একগাল হাসি নিয়ে বলল, 'আরে কুসুম, আয় আয়। কি খবর বল।'

তরুময় বাগচী জার্মানির রুহ্‌র্ ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। আই.আই.এস সি. থেকে পি এইচ ডি করে তারপর পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে এখন এখানে স্থায়ী হয়েছে। জার্মানির নাগরিকও হয়ে গেছে। আই.আই.এস সি.-তে থাকাকালীন কুসুমের সঙ্গে পরিচয়। কুসুম অবশ্য কম্পিউটার সায়েন্সের ডক্টরেট। তরুময়ের থেকে বছর পাঁচেকের ছোট। এক হোস্টেলে পাশাপাশি ঘরে থাকত বলে পরিচয় এবং খানিকটা ঘনিষ্ঠতা বলা যায়। তরুময় অবশ্য কুসুমকে একেবারেই পছন্দ করত না। বরাবরই তরুময় একটু ভালমানুষ প্রকৃতির ছিল। সেই সুযোগে সবাই তার পিছনে লাগত। বিশেষ করে এই কুসুমকীর্ণ কর।

কুসুম একটা রিভল্‌ভিং চেয়ারে বেশ আয়েশ করে বসে জিগেস করল, 'ট্যারা বললাম বলে আবার রাগ করলে না তো? তখন যা ক্ষেপে যেতে!' আসলে তরুময়ের এই ট্যারা নামটা একেবারেই মনঃপূত ছিল না। একদিন তরুময় ওর কয়েক বন্ধুর সঙ্গে ঘরে বসে কিছু লেখাপড়া করছিল। এমন সময় জটিলদা চেঁচাতে চেঁচাতে হাজির, 'কি রে তেরো, কি করছিস?' সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা নামটাকে লুফে নিল এবং মাত্র কয়েকটা রূপান্তরের মধ্যেই তরুময় হয়ে দাঁড়াল ট্যারা। তরুময়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। এবং এর পর থেকে সবাই ওকে ট্যারা বলেই ডাকত। তরুময়ের সব চেয়ে খারাপ লাগত যখন জুনিয়ররা ট্যারাদা বলত। কিন্তু কিছু করার নেই। তরুময় বড়ই ভালমানুষ ছিল। বিদ্রোহ করা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আজ আড়াই দশক বাদে সেই ট্যারা নামটা শুনে তরুময়ের অবশ্য রাগ হল না। বরং বেশ মজাই লাগল। কতদিন বাংলায় কথা বলে নি। বউ জার্মান। তাকে বা ছেলেকে তরুময় কখনই তেমন চেষ্টা করে নি বাংলা শেখানোর।

তরুময় বলল, 'না রে, অনেকদিন পরে শুনলাম নামটা। খুব খারাপ লাগল না! তা জটিলদার কি খবর রে?'

'কোন খবর নেই, বস্‌। শেষ শুনেছিলাম পুনেতে নাকি চাকরি করছে। সেও বছর কুড়ি আগে।'

'হ্যাঁ রে, তোর ভাষা এখনও সেই হাই ড্রেনের পচা জলের মতই আছে, নাকি মার্জিত হয়েছিস?'

'না মানে, বউ ছেলেমেয়ের সামনে ও ভাষায় কথা বলা যায় না। তবে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে একা থাকলে চালাই। যেমন ধর উত্তরীয়র সঙ্গে যখন নিভৃতে আড্ডা মারি। তবে আজ ঠিক করেছি তোমার সঙ্গে কোন খারাপ কথা বলব না। তুমি ওই সব শব্দ তো বলতেই না, এমনকী শুনলেই যা লজ্জা পেতে!'

তরুময় একটু হাসল। আজ বোধহয় আর লজ্জা পাবে না। কিন্তু অনর্থক ওইসব নোংরা শব্দ বলার বা শোনারই বা দরকার কি ! তাই সংক্ষেপে বলল, 'ভাল ! বলিস না।'

কুসুম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'উত্তরীয়কে মনে পড়ে ? ফিজিক্সেরই ছাত্র ছিল। আমার ব্যাচ্। তোমার উইঙেই ওর ল্যাব ছিল।' তরুময় অনেক ভাবল, কিন্তু মনে পড়ল না। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ায় বলল, 'তুই ব্যাংককের কথা বলছিস না তো ?'

কুসুম তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো। তা তুমিও দেখছি আসল নাম ভুলে গিয়ে ওই ডাকনাম মনে রেখেছ ! তুমি নিশ্চয়ই ওকে ব্যাংকক বলে ডাকতে না !'

'দ্যাখ, তোরা ওই বাজে ডাকনামগুলো এমন চালাতিস যে আসল নামগুলো ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। ওকে যদি কখনও ডেকে থাকি, তাহলে উত্তরীয় বলেই নিশ্চয় ডেকেছি। তবে মনে হয় না, ওকে ডাকার কোনদিন দরকার পড়েছিল। তোরা আমার থেকে অনেক জুনিয়র ছিলি কি না। তা ওর ওরকম বিদঘুটে নাম হল কেন ?'

'সে এক গল্প। ওর মামা না কাকা না জ্যাঠা কে একটা ব্যাংকক থেকে ওকে একটা হাতঘড়ি এনে দিয়েছিল। সেটা নাকি ওর বেজায় শখের ছিল। একদিন কে যেন, ন্যাড়াই বোধহয়, মাল – না খারাপ কথা নয় – মদ্যপান করে এসে ওর ঘড়ির ওপর বসে পড়েছিল। তাতে ঘড়িটা পুরো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ব্যাংকক ক্ষেপে গিয়ে এক মাস ন্যাড়ার সঙ্গে কথাই বলে নি।'

'ও ওরকম বসার জায়গায় ঘড়িটা রেখেছিলই বা কেন ?'

'আঃ ! বসার জায়গায় রাখবে কেন ? টেবিলে রেখেছিল। ন্যাড়া টেবিলেই উঠে বসেছিল। মাতালগুলো কেমন ঢ্যা – না, নো খারাপ কথা টুডে – মাতালগুলো কেমন ইয়ে হয় জানই তো !'

'উত্তরীয় করে কি এখন ?'

'ওই তোমারই মত। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তবে দেশে। আই. আই. এস সি.-তে।'

'কি নিয়ে কাজ করে ?'

'সে আমি কি করে জানব ? তোমাদের সব জটিল থিওরি ছাই আমি কি বুঝি ! !'

'তুই করিস কি এখন ?'

'আমি ব্যাঙ্গালোরেই আছি। সিমেন্সে – না, বলা উচিত জিমেন্সে। ওরা হপ্তা দুয়েকের জন্য জার্মানি পাঠাল। কাল কাজটা নেমে গেল। আজ তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করেই যাই। ডুসেলডর্ফ তো কাছেই !'

এরপর দুজনে পরস্পরের পরিবার পরিজন কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ে কিছু আলোচনা করল। পুরোনো জীবনের নানা ঘটনাও মনে করল। তরুময়ের বিশেষ করে মনে পড়ল সেদিনের কথা। রাত্তিরে ইয়েশওয়ান্তপুর থেকে কলা আর আম কিনে ফিরছিল। হঠাৎ কুসুমের সঙ্গে দেখা। সে বাড়িতে ফোন করে ফিরছে। ইনস্টিটিউটের গেটের বাইরে একটা স্থানীয় লোক, মাতালই হবে সম্ভবতঃ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক বেগ হালকা করছিল। কুসুম দেখেই বলল, এর প্রতিবাদ করা

উচিত। সোজা লোকটার কাছে গিয়ে রাগত স্বরে বলল, ‘ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।’ লোকটা ঘাব্ড়ে গিয়ে কি সব বলার চেষ্টা করল। কুসুম আরও রাগের ভান করে বলল, ‘কে ডাকে কাতর প্রাণে, বলে আয় ছুটে আয় ···!’ লোকটা বেশ বিচলিত হয়ে এবং লজ্জিত হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল যে ভুল হয়ে গেছে, তাছাড়া সে কুসুমের কথা কিছু বুঝতে পারছে না, কানাড়ায় সম্ভব না হলে যেন ইংরিজি বা হিন্দিতে বলে। কিন্তু কুসুম সে কথায় কর্ণপাত না করে পুরো কবিতাটা লোকটাকে গলায় যদ্দূর সম্ভব ঝাঁজ মিশিয়ে শোনাল। লোকটা কি বুঝল জানা যায় না, কেমন কাঁদ কাঁদ মুখে চলে গেল। সেই প্রসঙ্গ উঠল আবার। তরুময় বলল, ‘আমি কি ভয় পাচ্ছিলাম তখন। বিজন বিভুঁইয়ে এসে এইসব কেউ করে। লোকটা যদি আরও পাঁচটা লোক জড়ো করত তখন কি হত!’

কুসুম বলল, ‘ধুর! তুমি না একটা ভীতুর ডিম ছিলে। কত বা – দুষ্টুমি – করেছি সে সময়। তবে একবার বেজায় ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। তুমি বোধহয় তখন চলে গেছ। আমি বনশংকরীতে এক বন্ধুর বাড়িতে লাঞ্চের নেমন্তন্নয় যাচ্ছিলাম। রাস্তায় নেমে একটা পুলিশকে দেখে ভাবলাম জিগেস করি ঠিকানাটা কোনদিকে। আমার একটা স্বভাব ছিল পুলিশকে কুমড়োপটাশ বলে সম্বোধন করে তারপর কথা বলা। এখন এই বো – থুড়ি বাজে – পুলিশটা বাঙলা জানত। সে ক্ষেপে টেপে গিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। চারদিকে প্রচুর লোক জমে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। তারপর কানাড়ায় সবাই উত্তেজিত হয়ে কি সব আলোচনা করতে লাগল। আমি তো প্রমাদ গণছি, লোকজন ধরে কে – উঁহু পিটিয়ে – না দেয়। নেহাত সেই সময় আমার বন্ধু বাজার করে ফিরছিল। সে কানাড়া জানত। লোকজনকে বুঝিয়ে শান্ত করল। তারপর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে কি ধমক!’

এইসব কথাবার্তার মাঝে কুসুম জিগেস করল, ‘আজকাল তুমি মাউথ অর্গ্যান বাজাও? তখন তো বেশ বাজাতে। শুধু অনুষ্ঠানে বাজাতে বললেই বলতে সময় নেই। সারাজীবন খালি –’, কুসুম একটা নির্গতপ্রায় ‘গ’-কে গপ্ করে গিলে ফেলে বলল, ‘– বই মুখে করেই রইলে। লোকজন বোঝালেও তো বুঝতে না। এমন –’। কুসুম আবার একটা ‘গ’ গিলে খানিক ভেবে বলল, ‘এমন অনমনীয় ছিলে!’

তরুময় এবার খানিকটা বিরক্ত হল। এতটা গায়ে পড়া ও ব্যক্তিগত কথাবার্তা ওর পছন্দ নয়। সংক্ষেপে উত্তর দিল, ‘না!’

কুসুমকীর্ণ তার হাতব্যাগ থেকে পেল্লায় একটা ক্যামেরা বার করে তরুময়ের ছবি তুলল। তারপরই গণ্ডগোলটা বাঁধল। কুসুমের হঠাৎ একটা সাম্প্রতিক ঘটনা মনে পড়ায় বলল, ‘সেদিন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। এখানে আসার পর অফিসে ড্রেহার নামক একজনের সঙ্গে বেশ দোস্তি হয়ে যায়। সে বাড়িতে একদিন ডিনারের জন্য ইনভাইট্ করে। আমি সেই পার্টির কিছু ছবি তুলি। প্রিন্ট করিয়ে দেখলাম বেশ এসেছে ছবিগুলো। ভাবলাম ড্রেহারকে একটা করে কপি দিই। দিলাম। পরের দিন সে অনুরোধ করল আমি একদিনের জন্য নেগেটিভগুলো দিতে পারি কি না, কারণ ওর বউ একটা করে কপি রাখতে চায়। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। বর বউ একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকে। তাদের আলাদা আলাদা কপি চাই!’

তরুময় একটু অবাক্ হল, ‘সে কি! সেটাই তো স্বাভাবিক। আমার বউ তার ফটো কোথায় রাখে তা আমি কি করে জানব? তাছাড়া আমি তার প্রাইভেট জিনিসে হাত দেবই বা কেন? অ্যান্ড ভাইসি ভার্সা।’

'তাই বলে বর বউ কি কিছুই শেয়ার করবে না ? সামান্য একটা ছবিও না ! তাহলে আর বিয়ে করার, সংসার করার, কি মানে ?'

'আমি তা বলি নি তো। শেয়ার করার কত কি আছে ! ছবি তো মানুষের নিজস্ব জিনিস। তাতে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করবে কেন ?'

'কি জানি, ব্যাপারটা তোমার কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু এতটা ইন্ডিভিজুয়ালিজ্‌ম্ আমার ভাল লাগে না। ভারতে এরকম হবে না !'

এবার তরুময় হঠাৎ ক্ষেপে গেল। বলল, 'ইন্ডিভিজুয়ালিজ্‌ম্-এর তুই বুঝিস কি ? আগে বোঝ। তারপরে তো ভালমন্দ বিচার করবি !'

কুসুমকীর্ণও উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'বেশ তুমি তো দুটোই দেখেছ। তোমার কি মত ?'

তরুময় বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'দ্যাখ, এই নিয়ে আমি কখনও ভাবি নি। আমি ফিজিক্স নিয়ে আছি। থাকতে চাই। এ দেশে সুযোগ সুবিধা, টাকা পয়সা অনেক বেশী। পরিবেশও অনেক ভাল। তাই এখানে আছি। তার জন্য কিছু সামাজিক রীতিনীতি অন্যরকম হলে মানিয়ে নিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এতে ভাল হল না খারাপ হল তা নিয়ে ভাবার সময় আমার নেই।'

'ঠিক আছে ! কিন্তু সব কথা এমন পার্সোনালি নিচ্ছ কেন। আসলে তোমরা একটা পরিবেশে অভ্যস্ত, আর আমরা আর একটা পরিবেশে। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তা নিয়ে তোমার মত আমারও ছ্' কুসুম একটা বিশাল ঢোঁক গিলে একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, তাতে তোমার মত আমারও কিছু যায় আসে না।'

'তাহলে এসব প্রসঙ্গ তোলার কি মানে ?'

'মানে এটাই যে আমি অন্য পরিবেশ থেকে এসে এসব দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছি। আমার খারাপ লেগেছে। সেটাই বলেছি।' খানিক থেমে কুসুমকীর্ণ ফের বলল, 'ভাল ! কিন্তু তরুময়দা, একটা কথা বলি, কিছু মনে কর না ! তোমার কথায় মনে হল যেন তোমার দেশের ওপর কোথাও একটা রাগ আছে। অবশ্যই এটা তোমার পার্সোনাল ব্যাপার। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না !'

তরুময় চুপ করে রইল। তার মেজাজটা বেশ খিঁচড়ে গেছে। একে তো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা ঝুলে আছে। তারপর একটা উটকো লোক এসে জ্ঞান দিচ্ছে। সে একটু উশ্‌খুশ্ করতে লাগল। একেবারে 'আচ্ছা, এবার তাহলে আয়' বলতে সৌজন্যে বাঁধল। কুসুমকীর্ণ অবশ্য সেটা অনুমান করল। বলল, 'না গো, ব্যস্ত অধ্যাপক, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি ঠেঙিয়ে এখানে আসি নি। আমার একটা বিশেষ বক্তব্য আছে। বলি সেটা ?'

'বল।'

'ব্যাংকক, মানে উত্তরীয়, তোমাকে একটা রিকুয়েস্ট করেছে। তুমি নাকি রিসেন্টলি কি সব ভাল কাজকর্ম করে পেপারটেপার লিখেছ। উত্তরীয়র হাতে এখন ফান্ড আছে। ও চায় তোমার সময় থাকলে তুমি মাস খানেক কি দুয়েক

ইনস্টিটিউটে গিয়ে কিছু লেকচার দাও। ধর আসছে ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ। যাতায়াতের ভাড়া, তোমার থাকা খাওয়া ও অন্যান্য খরচাপাতি সব ওই দেবে। এমনকী তুমি সস্ত্রীক বা সপরিবারে আসলেও কোন সমস্যা নেই। অবশ্যই ও তোমাকে মেল করতে পারত। কিন্তু আমি যেহেতু এখানে আসছি, তাই বলল ভাল হয় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলে। এ কথাটা বলতেই আমার এখানে আসা।'

তরুময় বলল, 'এরকম হঠাৎ করে আমি কি করে ডিসিশন নেব ? আমায় কিছু সময় দিতে হবে। ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলতে হবে। ইউনিভার্সিটির পার্মিশন নিতে হবে। সর্বোপরি আমার নিজের ইচ্ছে আছে কি না ভেবে দেখতে হবে।'

'আরে, সময় তুমি নাও না ! তোমাকে আমার আর উত্তরীয়র ই-মেল দিয়ে যাচ্ছি। আমি কালই কেটে পড়ছি। তুমি যখন খুশি যোগাযোগ কর। তাছাড়া এই হল আমার হোটেলের ফোন-নাম্বার। কাল দুপুর এগারটা বারটা অবধি আছি।'

কুসুমকীর্ণ চলেই যাচ্ছিল। তরুময় বলল, 'লাঞ্চটা এখানেই করলে হয় না ?' কুসুমকীর্ণ জানাল, 'আমার আপত্তি নেই।' ওরা ইউনিভার্সিটির রেস্টুরেন্টে গেল। কিন্তু দেখা গেল সুর কেটে যাচ্ছে। বিশেষ কথাবার্তা আর হল না।

লাঞ্চের পর তরুময় হুবার্টের ফোন পেল আর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কথাটা বলে ফেলল। হুবার্টের ঠিক দু মিনিট লাগল সমাধান বাত্‌লে দিতে। তরুময় বেশ খুশি হল। যাক, প্রবলেমটা নামল। একটু দুঃখও পেল এটা ভেবে যে বয়স বাড়ছে, আজকাল আর ম্যানিপুলেটিভ ম্যাথামেটিক্‌স্ চট্ করে মাথায় আসে না। হুবার্টও প্রায় একই বয়সী, তবে সে পিওর ম্যাথমেটিসিয়ান।

তারপর অন্যান্য কাজকর্মে উত্তরীয়ের আহ্বানের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। রাত্রে সসেজ, পাঁউরুটি আর স্যালাড্ দিয়ে ডিনার খেতে খেতে কি একটা মনে হতে কথাটা ফের মাথায় এল। বউ ক্রিস্টিনাকে জানাল। সে প্রথমেই না করে দিল, 'বাপ্‌রে ওখানে যা গরম !' তারপর একটু ভেবে বলল, 'তবে ফেব্রুয়ারি-মার্চ তো বসন্তকাল।' তরুময় মৃদু হেসে বলল, 'ভারতে বসন্ত হয় না ! শীতের পরই গরম।' ক্রিস্টিনা একটু দোনামনা করে বলল, তাকে একটু সময় দিতে হবে। এর আগে ওরা একবারই ভারতে গেছে। সঙ্গে ওদের একমাত্র ছেলে আলমারও গিয়েছিল। তারই ভারতের গরমে সব চেয়ে আপত্তি ছিল।

রাত্রে বিছানার কোমল উষ্ণতায় শুতেই তরুময়ের মাথায় ঘুরতে লাগল সকালের ঘটনাগুলো। তরুময়ের হঠাৎ খুব রাগ হল, কিন্তু কার উপর সে ঠিক বুঝতে পারল না। প্রথমে কুসুমের উপর, তারপর পুরনো জীবনটার উপর, এমনকী শেষটায় ওই সসেজ আর পাঁউরুটিগুলোর উপরও। তরুময় কি সত্যিই অসুখী ?

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে ক্রিস্টিনা বলল, 'চল, যাওয়াই যাক। একটু ঘোরাঘুরিও হবে। তাছাড়া আলমার তো এখন নিশ্চয়ই যাবে না।' আলমার এখন মিউনিখে কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা করছে। সে নিজের পড়াশুনো ও বান্ধবীকে নিয়ে ব্যস্ত।

দশটা নাগাদ কুসুমকীর্ণ তরুময়ের ফোন পেল: 'আমি ব্যাঙ্গালোরে যেতে আগ্রহী। শুধু একটা শর্তে।'

'কি, বল।'

'তোরা একদিন আমাকে ইনভাইট্ করে খিচুড়ি খাওয়াবি।'

'খিচুড়ি ? হ্যাঁ, অবশ্যই। এটা আবার শর্ত হল ! কিন্তু এত খাবার থাকতে খিচুড়ি ! ঠিক আছে, তাই হবে ···'

তরুময় সস্ত্রীক ভারতে এসেছিল। খিচুড়ি ছাড়াও আলু-পোস্ত, মোচার ঘণ্ট, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, ইলিশ মাছের ডিমভাজা ইত্যাদি সব বাঙালী ডেলিকেসি প্রাণ ভরে খেয়েছে। আর ক্রিস্টিনা এই ট্রিপটা উপভোগ করেছে তরুময়ের থেকে অনেক গুণ বেশী। বিশেষ করে উত্তরীয় আর কুসুমকীর্ণের বউকে ওর অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে।

এদিকে ছাত্ররাও তরুময়ের লেকচার শুনে বিমোহিত। তারা তরুময় চলে যাবার আগে কিছু উপহার দিতে চায়। উত্তরীয়র কাছে পরামর্শ চাইতে সে বলল একটা মাউথ অর্গ্যান দিতে। আইডিয়াটা অবশ্য কুসুমকীর্ণের। ছাত্ররা একটু বিস্মিত হলেও মেনে নিল। এরপর ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়োজিত ফেয়ারওয়েল পার্টির দিন ছাত্ররা তরুময়কে মাউথ অর্গ্যানটা দিয়ে বলল বাজাতেই হবে। তরুময় প্রায় কুড়ি বছর মাউথ অর্গ্যান বাজায় নি। কিন্তু উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হল। এবং আবিষ্কার করল এখনও সে যন্ত্রটা খুব খারাপ বাজায় না। ছাত্ররা তো তাকে কিছুতেই ছাড়বে না। প্রায় আধঘণ্টা টানা বাজাতে হল।

গেস্ট হাউসে ফিরে গোছগাছের সময় ক্রিস্টিনা বেশ অভিমানের সুরে বলল, 'তুমি এত সুন্দর মাউথ অর্গ্যান বাজাও আগে বল নি কেন ?' তরুময় একটু কিন্তু কিন্তু স্বরে বলল, 'না, ভাবতাম তোমার ভাল নাও লাগতে পারে।' ক্রিস্টিনা বেশ বিরক্ত হয়ে জানাল, 'না শুনিয়েই তুমি ধরে নিলে আমার খারাপ লাগবে। এ কিন্তু ভারি অন্যায়।' তরুময়ের সত্যিই কোন জবাব নেই। গভীর মমতায় সে ক্রিস্টিনাকে বুকে টেনে নিল।

[মার্চ ২২, ২০০১]

জীবাণু

রাইনের ধারে সুন্দর ছোট্ট একটা শহর লেফারকুসেন। তারই একটা প্রাইভেট ইন্-ডোর সুইমিং পুল। রবিবার দুপুর বারটা। বাচ্ছা বড় মিলিয়ে অনেকে সাঁতার কাটছে। হেল্‌গা আর তার সাত বছরের ছেলে রাল্‌ফ্‌ও সাঁতার কাটছে। মাস ছয়েক হল হেল্‌গা রাল্‌ফ্‌কে সাঁতার শেখাচ্ছে। এর মধ্যেই সে রীতিমত ভাল সাঁতার শিখে গেছে।

হেল্‌গার হঠাৎ মনে হল আহমেদকে একটা ফোন করা দরকার। এখনও বোধহয় সে ঘুমচ্ছে বা না ঘুমলেও বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছে। এরপর ওরা তিনজন ডাউনটাউনে লাঞ্চ করতে যাবে যে।

ঘরের ভিতর সিগন্যাল লো থাকে বলে হেল্‌গাকে ওর সেল ফোনটা নিয়ে বাইরে আসতে হল। রাল্‌ফ্‌কে বলল জল থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিতে। কিন্তু সে বলল আর একটা রাউন্ড মেরে তারপর উঠছে। হেল্‌গা ভেবে দেখল রাল্‌ফ্ এখন যেরকম সাঁতার জানে তাতে তার ডুবে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। কাজেই মিনিট পাঁচ দশ তাকে একলা ছেড়ে যাওয়াই যায়।

জেনিফার আজ বড় ক্লান্ত। গতকাল ওদের বাড়িতে একটা বিশাল পার্টি ছিল। তাতে বড় বেশী হই হুল্লোড় হয়েছে। প্রচুর মদ্যপানও হয়েছে। তারপর পার্টি ভাঙার পরে ক্লাউসের ভালবাসার অত্যাচার। ক্লাউস মাঝে মাঝে বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলে। অবশ্য জেনিফার যে সেটা অপছন্দ করে তা নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে আজ জেনিফার সত্যিই বড় ক্লান্ত।

ক্লান্তিটা দূর করতে জেনিফার জলে নেমেছে। ধীরে ধীরে এপার ওপার করছে। জলের এই স্নিগ্ধ শীতলতায় বড় আরাম। ডীপ এন্ডে পৌঁছে জেনিফার একটু জিরচ্ছিল। হঠাৎ দেখল অন্য প্রান্তে কিছু একটা হচ্ছে। তিনজন লোক জলের মধ্যে কি যেন করার চেষ্টা করছে। একজনকে জেনিফার ভালরকম চেনে। বিচ্ছু কার্‌স্টেন্। ওদের অ্যাপার্টমেন্ট্ বিল্ডিং-এই থাকে। বয়স কুড়ির মত। বাকি দুজনের একজনকে ও মাঝে মাঝে পাড়ায় দেখেছে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে। তৃতীয়জনকে জেনিফার চেনে না।

ফোন করে ফিরে এসে হেল্‌গা পুলে রাল্‌ফ্‌কে দেখতে পেল না। ভাবল সে নিশ্চয়ই টয়লেটে গেছে বা শাওয়ার নিচ্ছে। টাওয়েলটা বের করে সে একটা ধারে বসে পড়ল।

শ্যালো এন্ডের দিকে ফিরে জেনিফার কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। প্রথমে সে তেমন পাত্তা দেয় নি। কারণ জলে মাঝে মাঝেই ধাক্কা লাগে, বিশেষ করে বাচ্ছাদের সঙ্গে। কিন্তু যখন বুঝল জিনিসটা নড়ছে না তখন কৌতূহল বশে নিচের দিকে তাকাতে আবিষ্কার করল একটা বাচ্ছার দেহ। বীভৎস ! চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। হাত দুটো মুঠো পাকানো।

প্রথম প্রতিক্রিয়ায় জেনিফার একটা আর্তনাদ করে দূরে ছিটকে গেল। তারপরই মনে হল বাচ্ছাটাকে এখনও হয়ত বাঁচানো যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সে দেহটাকে চেপে ধরে পুলের ধারে তুলে দিল। জেনিফারের হাত পা সারা শরীর এক অসম্ভব ভয়ে কাঁপছে। কি আশ্চর্য, চারদিকে এতগুলো লোক, কেউ এই দুর্ঘটনাটা দেখে নি ! তা কি করে হয় ! কাঁচের মত স্বচ্ছ জল। তাছাড়া পুলের অ্যাটেন্ডেন্টই বা কি করছিল, তার তো সব কিছু নজর রাখার কথা !

হেল্‌গা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যে ছেলেটা গোটা পুলে দাপিয়ে বেড়ায় সে পাঁচ সাড়ে পাঁচ ফুট গভীরতার জলে ডুবে গেল ! সে পাগলের মত তার প্রাণাধিক পুত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

জেনিফার খানিকটা ধাতস্থ হতে আবিষ্কার করল আশেপাশে লোকজন বড় বেশী নীরব। কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। এখনও বাচ্ছাটা যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার দরকার প্রাথমিক চিকিৎসা। তাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদলে কিছু হবে না। জল থেকে উঠে সে বাচ্ছার মাকে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু হেল্‌গা তখন শোকে পাগল। তার কানে কিছু ঢুকছে না। জেনিফার নিজেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে চাইল। কিন্তু হেল্‌গা যেভাবে দেহটাকে আঁকড়ে ধরে আছে, তাতে জেনিফারের পক্ষে কিছু করা অসম্ভব। সে চেঁচামেচি জুড়ে দিতে কিছু লোক এগিয়ে এল। বাচ্ছাটার শুশ্রূষার চেষ্টা করল। ডাক্তার ডাকা হল। পুলিস ডাকা হল। কিন্তু তখন বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে।

ঘরে ফিরে জেনিফারের কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মৃত রাল্‌ফের বাবা আহমেদ পাকিস্তানী। হেল্‌গা জার্মান হলেও রাল্‌ফের রক্ত বিশুদ্ধ জার্মান রক্ত নয়। সেই জন্য তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ এটা একটা সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এবং জেনিফার বুঝতে পারল সেটা সম্পন্ন করেছে কার্‌স্টেন্‌ ও আরও দুজন যাদের সে পুলের অন্য প্রান্ত থেকে দেখেছে জলের মধ্যে কিছু চেপে ধরে থাকতে। এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল কেন অন্যান্য লোকজন দেখে থাকলেও কিছু বলে নি বা করে নি, পুলিসের কাছেও কিছু স্বীকার করে নি। সবাই এইসব নব্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিকদের ভয় পায়।

একটা অজানা আতঙ্ক, একটা দিশাহারা ভয় জেনিফারকে গ্রাস করে ফেলল। একটা অস্পষ্ট অপরাধ বোধ তার বুকে কাঁটার মত বিঁধে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল সে আর একটু সজাগ হলে বোধহয় রাল্‌ফ্‌কে বাঁচানো যেত। এখন তার মানবিক কর্তব্য পুলিসকে সব জানানো। অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু জেনিফার জানে এতে তার নিজের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। খুনীদের সংগঠন তাকে ছেড়ে দেবে না। এই সময় বড় বেশী দরকার ক্লাউস্‌কে। কিন্তু সে যে সারাদিন কোথায় গিয়ে বসে থাকে !

বেশ রাতে ক্লাউস্‌ ফিরল। ফিরতেই তার বুকে মুখ গুঁজে জেনিফার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে সব জানাল। ক্লাউস্‌ সব শুনে প্রথমেই বলল, 'তুমি এর মধ্যে থেকো না। ওদের ক্ষমতা তুমি জান না। তোমার জীবন, আমার জীবন, সব কিছু তছনছ করে দিতে পারে। কি দরকার উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ?' জেনিফার বলল, 'তাই বলে আমি চোখের সামনে এমন একটা বীভৎস অপরাধ দেখে চুপ করে থাকব !' ক্লাউস্‌ বোঝানোর চেষ্টা করল, 'মানছি, মনুষ্যত্বের খাতিরে তোমার প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু নিজের জীবনকে বিপন্ন করে এত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে ? তাছাড়া তুমি স্পষ্ট করে কিছুই দেখ নি। ঠিক কি না ? তোমার বানানো গল্প আদালত মেনে নেবে কেন ?'

আরও কদিন কাটল। জেনিফারের অপরাধ বোধটা গভীরতর হতে থাকল। শেষে সে একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে বেনামে পুলিসকে ফোন করে সব জানাল। কিন্তু মুশকিল হল তার সেই অসামান্য সাফল্যের কথা ক্লাউস্‌কে জানাতে ক্লাউস্‌ প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়ল, 'ওঃ, পুলিসের পক্ষে কে ফোন করেছে সেটা বের করা অসম্ভব সোজা কাজ। সব জানাজানি হয়ে যাবে। তুমি এত নির্বোধ জানতাম না তো। অন্ততঃ ফোন করার আগে আমাকে একবার জিগেস করতে পারতে তো !'

জেনিফার অত্যন্ত বিরক্ত হল। সেও গর্জে উঠল, 'তুমি এত ভীতু জানতাম না তো ? তোমাকে তো পুরুষ বলতে লজ্জা হচ্ছে ! তোমার কাছে পরামর্শ নেব ! !'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের ঝগড়াটা একটা সুগভীর তিক্ততায় পর্যবসিত হল। এমনকি ওদের তিন বছরের লিভ টুগেদারের ইতি ঘটল।

জেনিফার এখন একা। সে মনঃস্থির করে ফেলেছে সে আর বেনামে লুকিয়ে থাকবে না। সবার সমক্ষে বেরিয়ে এসে মানুষের মত লড়াই করবে। অপরাধীর সাজা না হওয়া পর্যন্ত সে থামবে না। তাতে তাকে যা মূল্য দিতে হয় দেবে।

কোর্টে মামলা উঠল। দোষীর কাঠগড়ায় কার্স্টেন, ফ্রিড্হেল্ম্ ও সুইমিং পুলের কেয়ার টেকার মার্কুস্। তৃতীয় খুনী বেপাত্তা। রাল্ফের দেহে ধস্তাধস্তির কিছু দাগ পুলিস আবিষ্কার করেছিল। এবং সে যে ভাল সাঁতার জানত সে কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছে। প্রথম দিকে অবশ্য কেউই খুনীদের বিরুদ্ধে কোনও সাক্ষ্য দিতে চায় নি। কিন্তু জেনিফার সব কথা অকপটে স্বীকার করার পরে বাকিরাও অনেকে সাহস পেয়ে এগিয়ে এসেছে।

কার্স্টেন ও ফ্রিড্হেল্মের কুড়ি বছর করে জেল হল। মার্কুসের অপরাধের কোনও স্পষ্ট প্রমাণ বা সাক্ষ্য ছিল না। তাই তাকে কোনও সাজা না দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হল।

মামলার শেষে আহমেদ ও হেল্গা জেনিফারকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আমরা আর রাল্ফ্কে ফিরে পাব না এটা ঠিক। কিন্তু ভবিষ্যতে ওই অপরাধীদের হাতে অন্য কোনও মা বাবা যাতে তাদের সন্তানকে না হারায়, তার জন্য এই শাস্তিটা দরকার ছিল।'

কোর্টের বাইরে জেনিফারের সঙ্গে ক্লাউসের দেখা হল। ক্লাউস্ জেনিফারের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে একটু তিক্ত হেসে বলল, 'তোমারই জয় হল! অনেক অভিনন্দন।' তারপর কাঁধে বিশাল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শেষ করল, 'সাবধানে থেকো! আমার আর কিছু বলার নেই।' জেনিফার পাল্টা খোঁচা দিল, 'উপদেশ ও অভিনন্দনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমার অন্য কথা শোনারও আর কোনও প্রয়োজন নেই।'

গাড়িতে স্টার্ট দিতে গিয়ে হঠাৎ ক্লাউসের একটা কথা জেনিফারের মাথায় অন্যভাবে বেজে উঠল: 'সাবধানে থেকো।' এ কি শুধুই শুভেচ্ছা বা সদুপদেশ, না কি হুমকি? তাহলে কি ক্লাউস্ও ওই খুনী সংগঠনের সদস্য? এবং সেই জন্যই কি সে জেনিফারকে এত বাঁধা দিয়েছে? একটা শীতল আতঙ্কের স্রোত জেনিফারের শিরদাঁড়া বেয়ে বয়ে গেল।

[সত্য ঘটনার ছায়ায়]

(এইরকম দুর্বোধ্য ভাষায় নিও নাৎসীরা নিজেদের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান করে।)

[এপ্রিল ৬, ২০০১]